পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ১৯শ সংখ্যা

❑ ১৫ এপ্রিল ১৯৯৮ ঈসাব্দ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস' (রাহেঃ)-এর সাথে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (বর্তমান খলীফা- আইঃ)

দূরপ্রাচ্যে আন্তর্জাতিক সীমারেখায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কাদিয়ানের সালানা জলসা পবিত্র রমযানের কারণে ৫, ৬, ও ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ অনুষ্ঠিত হবে

সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এ বছর পবিত্র রমযান মাসের প্রেক্ষাপটে কাদিয়ানের সালানা জলসার তারিখ ৫, ৬, ও ৭ই ডিসেম্বর রোজ শনি, রবি ও সোমবার অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্যে সদয় অনুমোদন দান করেছেন।

জামাতের বন্ধুগণকে এ বা-বরকত সফরের জন্যে এখন থেকে প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে ও দারুল আমান কাদিয়ানের এ কল্যাণময় জলসার সফলতার জন্যে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নায়ের দাওয়াত ও তবলীগ, কাদিয়ান

লন্ডনে আহমদীয়া কেন্দ্রে বাঙ্গালী সমাবেশ

গত রোববার ২২ মার্চ ১৯৯৮ ইং লন্ডনে ১৬ নং গ্রীসেন হল, রোডস্থ মাহমুদ হলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইউ.কে-র বাংলা বিভাগের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ "বাঙ্গালী সমাবেশ" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থান হতে বহু পুরুষ ও মহিলা অতিথি যোগদান করেন। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জাতিসংঘের সাবেক রাষ্ট্রদূত ইফতেখার আয়াজ, ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইউ. কে.। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেন মৌলানা ফিরোজ আলম। দ্বৈতকণ্ঠে বাংলা গযল পেশ করেন যুগল ভাই তারেক ও যুবায়ের। তারপর আমদীয়া মুসলিম জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেন মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, ইউ. কে.। তিনি তাঁর বক্তব্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কার্যক্রম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক বিশ্বের ৫০ টিরও বেশী ভাষায় পবিত্র কুরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশ এবং মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া (MTA) আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে দৈনিক ২৪ ঘন্টা সারা বিশ্বে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার ইত্যাদির উল্লেখ করেন। সমাবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ে উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষে একটি বয়াত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে একট ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী দেখানো হয়। সভা শেষে আগত মেহমানদেরকে এক নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

মোহাম্মদ আবদুল হাদী, বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

দেশের বিভিন্ন স্থানে মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবস পালিত

আহমদী ডেস্কঃ গত ২৮ মার্চ, '৯৮ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবস' পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর জীবনী, কর্মকাণ্ড, সফলতা ও দিবসটির তাৎপর্য এবং গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত যে সকল জামাত ও সংগঠন থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে তারা হলেন– ঢাকা, গাজীপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা, ক্রোড়া, আহমদ নগর, চুয়াডাঙ্গা, সুন্দরবন, বরিশাল (প্রথম প্রচেষ্টা), রাজশাহী ও নাসেরাবাদ, চড়াইখোলা, পটুয়াখালী ও রংপুর জামাত এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মীরপুর।

বর্ষচক্রে বাংলা বর্ষের আর একটি কাঁটা ঘুরে গেল। ১লা বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি আনন্দঘন মুহূর্ত। নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমি বাংলা ভাষা-ভাষী সকল ভাই-বোনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি যেমন আমাদের গৌরব আমাদের ঐতিহ্য তেমনি এর পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে আমাদের সকলের অবদান রাখা দরকার। কেবল আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে দিনটি পালনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীত্বের গৌরব ও ঐতিহ্যকে যেভাবে জাহির করা হয় এর তেমন কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। আসল বিষয় হলো মনে প্রাণে বাংলা ভাষাকে ভালোবাসা ও এর উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করা। এ মুহূর্তে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল (এম.টি.এ)-এর সুখ্যাতি না করে পারছি না। সারা বিশ্বে ইহা অহোরাত্র যেসব অনুষ্ঠাদি প্রচার করে থাকে তার মধ্যে বাংলা অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। দৈনিক অন্যান্য অনুষ্ঠান বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করা ছাড়াও ইহা ৪ বার বাংলা খবর প্রচার করে এবং প্রায় এক ঘন্টার বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। বিশ্বের আর কোন সম্প্রচার মাধ্যম এমনকি স্বদেশী প্রচার মাধ্যমও বিশ্বব্যাপী এত সময় ধরে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করে বলে আমরা অবহিত নই। আমরা বাংলা ভাষা-ভাষি সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যেন মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল-এর স্বচ্ছ ও নির্মল ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ সম্বলিত অনুষ্ঠানগুলো প্রত্যক্ষ করেন। তবলীগ সম্বন্ধে বিগত সংখ্যায়ও বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তবলীগ আমাদের জীবন। তবলীগ ব্যতিরেকে মু'মিনের হৃদয়ে প্রাণসঞ্চার হতে পারে না। তাই তবলীগ আমাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় ইমামের নির্দেশের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবলীগ করতে গিয়ে আমরা যেন নিজেদের অভ্যন্তরভাগেও দৃষ্টি দান করি। আমাদের মধ্যে যদি আনুগত্য ও আমালে সালেহার অভাব থাকে তাহলে ঐ তবলীগ ফলদায়ক হবে না; আর হলেও তা পরিপক্ক হবে না। হুযূর (আইঃ) কখনও সংখ্যার ওপরে জোর দেননি। তিনি চান তবলীগের গুণগত মান এবং বয়াতীদের গুণগত মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে। গত ২৭ শে মার্চের খুতবায় হুযূর (আইঃ) এসব বিষয়ের ওপরে সবিশেষ জোর দিয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে হুযূর (আইঃ)-এর দিক-নির্দেশনার ওপর পুরোপুরি আমল করে তবলীগ করার সৌভাগ্য দান করুন। বর্তমান বাংলা নববর্ষে আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে আমাদের' দায়িত্বাবলী সঠিকভাবে পালন করার তৌফীক দিন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ১৯শ সংখ্যা

২ বৈশাখ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ ❑ ১৭ যিলহজ্জ ১৪১৮ হিঃ কাঃ
১৫ শাহাদত ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ❑ ১৫ এপ্রিল ১৯৯৮ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
জাভেদ এ, মতিন	-	ক্যালিফর্নিয়া
আব্দুর রব	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

দেশ ও সরকারের প্রতি আনুগত্য বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত

কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় মাতৃভূমিকে ভালবাসা ও ঐ দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি আনুগত্য করা ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদ ও নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সুন্নত থেকে ইহা প্রমাণিত। আল্ কুরআন আমাদের 'উলীল আমর'-এর অর্থাৎ আদেশ দেবার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের আদেশের প্রতি আনুগত্য করার শিক্ষা দিয়েছে। অবশ্য তা যদি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার বিরুদ্ধে না হয়। নবী আকরম (সাঃ) দীর্ঘ তের বছর ধরে মক্কায় চরম নির্যাতন সহ্য করেছিলেন; কিন্তু তিনি ঐ সময়ের কোন শাসন ব্যবস্থার (আসলে সেখানে বর্তমানকালের ন্যায় কোন প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা ছিলো না। গোত্রভিত্তিক এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি বা বিদ্রোহ করার শিক্ষা দেননি। তাঁর (সাঃ) অনুসারী মুসলমানদের ওপরে কাফের কর্তৃক অসহনীয় যুলুম-অত্যাচার হলে তিনি তাদেরকে নাজ্জাশীর দেশ আবিসিনিয়া এবং পরে মদীনায় হিজরত করার আদেশ দিয়েছিলেন। এর পরে সেখান থেকে যুদ্ধ করে তাঁরা মক্কা বিজয় করেন। দেশের অভ্যন্তরে থেকে দেশের বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শিক্ষা হুযূর (সাঃ) দেন নি।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাঞ্জাবে শিখ শাহীর যুলুম-অত্যাচার চরমে পৌছলে সেখানকার মুসলমানগণ হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। মুসলমানদের নাগরিক অধিকার তো দূরের কথা তারা নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করার মানবিক সুযোগ-সুবিধা থেকেও ছিলেন বঞ্চিত। আযান দেবার কারণে একজন মুসলমানকে জান দিতে হতো। প্রত্যেক ইতিহাস পাঠক এসব ঘটনা অবহিত আছেন। এহেন অবস্থায় ভারতে যখন বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হলো তখন হিন্দু, মুসলিম প্রভৃতি সকলে যেন নিজ নিজ ধর্মকর্ম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে ইংরেজ শাসকগণ তার সুব্যবস্থা করলেন। এ কারণেই ইসলামের শিক্ষানুযায়ী বৃটিশদের প্রশংসা করেছেন যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম। একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্যে এ কাজটা সত্যই ছিলো বাঞ্ছনীয় এবং প্রশংসার্হ। কিন্তু তাঁর (সাঃ) এ কর্মকাণ্ডকে আজ বক্র দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। তাঁকে বৃটিশদের রোপিত বৃক্ষ, ইংরেজদের দালাল প্রভৃতি বলে আসল বিষয় থেকে এতদিন পরে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে একটি চিহ্নিত গোষ্ঠি বা চক্র। গত ১৯-৩-৯৮ তারিখের দৈনিক সংগ্রামে জনৈক মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব "কাদিয়ানীবাদ ইংরেজদের আনুগত্যকে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করেছিল" শিরোনামে একটি প্রবন্ধে ঐ বিষয়টিকেই উস্কে দেবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁর (আঃ) আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আ, ফ, ম, খালিদ হোসেন নামক জনৈক প্রবন্ধকার ২-৪-৯৮ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবে 'বৃটেনে মাটির তলায় খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা' শিরোনামের প্রবন্ধে। অথচ ইংরেজ সরকারের আনুগত্যে ঐ সময়ের আলেম ওলামারাও একমতই প্রকাশ করেছেন বরং বেশী। এ প্রসঙ্গে বহু উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। আমরা নিম্নে কয়েকজন খ্যাতনামা বিশিষ্ট চিন্তাবিদের মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি :

(১) বৃটেনের সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া মারা গেলে ড. মুহম্মদ ইকবাল ১১০ লাইনের এক বেদনাহত শোকগাঁথায় লিখেন :
"হে ভারত! তোমার মাথা থেকে খোদার ছায়া উঠে গেছে" (১৯১১ সনে দিল্লীর দরবারে অভিষেক উপলক্ষ্যে স্মরণিকা, পৃষ্ঠা ৫০৭)।

(২) ১৮৮৭ সনে মাওলানা আলতাফ হুসায়েন হালী ইংরেজ সরকারের প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্বাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবিতা লেখেন :
"বৃটিশ সম্রাটের পরিবারবর্গের ওপরে খোদার ছায়া থাকুক।
আর হিন্দুস্থানের নতুন প্রজন্মের ওপরে থাকুক বৃটিশ সম্রাটের ছায়া"
(কুল্লিয়াতে নযমে হালী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ২৭০)।

(৩) মৌলবী মওদূদী লেখেন :
"এ শর্তসমূহ এখানেও পূর্ণ হয়নি যার মাধ্যমে ইসলাম তরবারীর জেহাদের অনুমতি দিয়েছে...কোন জামাত এবং কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমীর যেহেতু এখানে হিন্দুস্থানে মজুদ নেই এ কারণে তরবারীর জেহাদ বিধিসম্মত নয়"
(তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৪৫ খৃ. পৃ. ১৮২)।

(সূচীপত্রের নিচে দেখুন)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ (তফসীর সহ)	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩-৪
❑ হাদীস শরীফ ঃ দোয়া	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা– মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
❑ অমৃতবাণীঃ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) 'বরাহীনে আহমদীয়া' পুস্তক থেকে	ঃ অনুবাদ–মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৫
❑ হাকীকাতুল ওহীঃ মূল–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ–জনাব নাজীর আহমদ ভূঁইয়া	৬
❑ জুমুআর খুতবাঃ তাকওয়া ও ঈমানের প্রকৃত মর্মকথা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ–মাওলানা বশীরুর রহমান	৭-১৩
❑ ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব) মূল– হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী, আল মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)	ঃ অনুবাদ–জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৪-১৫
❑ উটে চড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৬
❑ জুমুআর খুতবাঃ নিজেদের সুরক্ষার অমোঘ ঐশী-ব্যবস্থা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ–মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭-২৩
❑ মানবমন্ডলী একই জাতিভুক্ত	ঃ ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম খান	২৪-২৫
❑ ছোটদের পাতাঃ শমায়েল হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ পরিচালক– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৬
❑ জুমুআর খুতবাঃ আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকার ভরসা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ–মাওলানা সালেহ আহমদ	২৭-৩৩
❑ আপত্তির উত্তর	ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৩৪-৩৭
❑ কুরআনী জিন্দেগী	ঃ সংকলনে ঃ জনাব খোন্দকার আজমল হক	৩৮
❑ কবিতা ঃ আহবান	ঃ জনাব কে এম মাহমুদুল হাসান	৩৮
❑ সম্পাদকের কাছে লিখিত পত্র ঃ সোহায়েল শরীফ, লাহোর	ঃ অনুবাদ– মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	৩৯
❑ প্রচ্ছদ পরিচিতি	ঃ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত	

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

উপরোক্ত বক্তব্যগুলোকে আলী নদভী সাহেব ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা কি দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করবেন, বলবেন কি? তাদের সম্বন্ধেই বা কি মতামত প্রকাশ করবেন?

হযরত মির্যা সাহেব আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে একদিকে যেমন ইংরেজদের শোকরিয়া আদায় করেছেন তেমনি তাদেরকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তবাদ থেকে ফিরে আসার জন্যে তাদের তথাকথিত খোদা যীশুখৃষ্টের মৃত্যু প্রমাণ করেছেন এবং তাঁর সমাধি যে কাশ্মীরে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এমনকি বৃটিশ সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে 'তোহ্‌ফাতুল কায়সারিয়া' নামক পুস্তক রচনা করে তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্‌বান জানিয়েছেন। আজ যারা মির্যা সাহেবের সম্পর্কে 'ইংরেজ তোষণের' মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করছেন তাদের ওস্তাদগণ বা তারা কি কখনো ইসলামের সেবায় এমন খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন বলে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবেন? আদৌ পারবেন না।

অনেক সময় আহমদীয়তের বিরুদ্ধবাদীরা হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) সম্বন্ধে এই অপপ্রচারণা করে থাকেন যে, মির্যা সাহেবকে ইংরেজরা নবী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। যুক্তির খাতিরে যদি একথা মেনেও নেয়া হয় তাহলে তাদের খোদা কি এতই দুর্বল যে, ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে অর্ধশতাব্দীকাল আগেই অথচ মির্যা সাহেবের জামাত সারা বিশ্বের প্রায় ১৬০টি দেশে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পর উন্নতি করে যাচ্ছে আর তাদের খোদা তাকে (মির্যা সাহেবকে) বিফল মনোরথ করে দিতে পারছেন না?

আর একটি বিষয় স্বতঃই নদভী সাহেবের লেখা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে সময়ের কথা তিনি লিখেছেন ঐ সময়টা সত্যিই একজন মসীহ্‌র আবির্ভাবের অপেক্ষা করছিলো। হযরত মির্যা সাহেব যথাসময়ে মসীহ্ ও মাহদী দাবী করেছেন, আমরা তাঁকে মান্য করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। যদি নদভী সাহেবদের দৃষ্টিতে হযরত মির্যা সাহেব সত্যবাদী মসীহ্ ও মাহদী না হয়ে থাকেন (নাউযুবিল্লাহ্) তাহলে তাকে আর কোন মাহ্দী ও মসীহ্‌কে দেখিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করছি, যাকে আমরা মান্য করতে পারি। কিন্তু নদভী সাহেবরা অতীত যুগের ন্যায় চিৎকার করেই যাবেন, না তারা সত্য বলে অন্য কাউকে দেখাতে পারবেন আর না আগমনকারী ব্যক্তিকে মান্য করার সৌভাগ্য তাদের কপালে জুটতে পারে।

কুরআন মজীদ

সূরা আন্ নিসা-৪

১৬০। আর আহলে কিতাব হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজ মৃত্যুর[৭০১] পূর্বে ইহার (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখিবে এবং সে (ঈসা) কিয়ামতের দিনে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে।

১৬১। সুতরাং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের যুলুমের কারণে আমরা তাহাদের জন্য সেইসব পবিত্র বস্তু[৭০২] হারাম করিয়াছি যাহা তাহাদের জন্য (পূর্বে) হালাল করা হইয়াছিল এবং বহু লোককে আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের বাধা দেওয়ার কারণেও (তাহাদের এই শাস্তি হইয়াছিল)।

১৬২। এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহাদের অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণেও। আর তাহাদের মধ্যে কাফেরদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।[৭০৩]

১৬৩। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে জ্ঞানে পরিপক্কগণ[৭০৪] এবং মু'মিনগণ ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপরও যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল, এবং তাহারা নামায কায়েম করে[৭০৫] এবং যাকাত দেয় এবং ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ দিবসের উপর, এই সব লোকই এমন যাহাদিগকে আমরা মহা পুরস্কার দিব। (২২ রুকূ)

১৬৪। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি যেরূপে আমরা নূহ এবং তাহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম; এবং আমরা ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্, ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরগণ এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের উপর ওহী করিয়াছিলাম এবং দাউদকেও আমরা যবূর[৭০৬] দিয়াছিলাম।

১৬৫। আর (আমরা প্রেরণ করিয়াছি) এমন অনেক রসূল, যাহাদের বৃত্তান্ত ইতোপূর্বে আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং এমন অনেক রসূল, যাহাদের বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করি[৭০৭] নাই, এবং আল্লাহ্ মূসার সহিত অনেক বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।[৭০৭-ক]

৭০০। ইহুদীরা উল্লাসের সহিত দাবী করে, তাহারা ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে নিহত করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি নবী ছিলেন না, বরং মিথ্যা দাবীকারক ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াত ও আলোচ্য আয়াত মিলিয়া, ইহুদীদের মিথ্যা অপবাদকে খণ্ডন করিয়াছে এবং তাহাদের আরোপিত সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হইতে তাহাকে মুক্ত ঘোষণা করিতেছে। আরও ঘোষণা করিতেছে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌তাআলার নিকট আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চস্তরে সম্মানিত আসনে সমাসীন আছেন। এই আয়াতের কোথাও ঈসার (আঃ)সশরীরে আকাশে উঠার কথা নাই। আয়াতে করীমা শুধু এই কথাই বলিতেছে যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে নিজের সন্নিধানে সম্মানিত করিয়াছেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র কাছে উঠাইবার অর্থে কোনও নির্দিষ্ট জাগতিক স্থানে নিয়া যাওয়া বুঝাইতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্‌র জন্য কোন বাসস্থান নির্ধারণ করা যায় না।

৭০১। 'তাহার মৃত্যুর পূর্বে' এই কথাটিতে 'তাহার' সর্বনামটি 'প্রত্যেক ব্যক্তিই'-এর স্থলে বসিয়াছে। মোট কথা, অর্থ এই বুঝায় যে, আহলে-কিতাবের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের মৃত্যুর পূর্বে ইহাই বিশ্বাস করিবে যে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ক্রুশেই হইয়াছে। 'মাওতিহি'র অন্য একটি পঠন 'মাওতিহিম' (তাহাদের মৃত্যু) এই অর্থের পূর্ণ সমর্থন করে। এই ভিন্ন পঠন 'মাওতিহিম' উবাই কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে (জরীর, ৬ষ্ঠ, ১৩)। ইহুদীরা বিশ্বাস রাখে যে, তাহারা ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে মারিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে, তিনি (মাযাআল্লাহ্) সত্য নবী ছিলেন না বরং মিথ্যা দাবীদার ছিলেন। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কারণ, এই ক্রুশীয় মৃত্যুকে ভর করিয়াই তাহারা প্রায়শ্চিত্তবাদ গ্রহণ করিয়াছে।

৭০২। এই আয়াত এমন কোন জাগতিক বস্তুর কথা বলিতেছে যাহা ভোগ করা পূর্বে ইহুদীদের জন্য অনুমোদিত ছিল, পরে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কেননা, মূসা (আঃ)-এর পরে তাহাদের মধ্যে এমন শরীয়তবাহী নবী আসেন নাই যিনি তওরাতের অনুমোদিত বস্তু তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। বরং এই কথা বলিতেছে যে, তাহারা আধ্যাত্মিক ও ঐশী অনুগ্রহরাজি হইতে বঞ্চিত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়াই বলিয়াছিলেন, "এবং এই জন্য (আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদের জন্য হালাল করি কতক বস্তুকে যাহা পূর্বে তোমাদের উপরে হারাম করা হইয়াছিল (৩ঃ৫১)"-অর্থাৎ তোমাদের অপকর্মের দোষে যেসব ঐশী অনুগ্রহরাজি হইতে তোমরা বঞ্চিত হইয়াছ, সেইগুলির কতক তোমাদের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে আমি আসিয়াছি।

৭০৩। ইহুদীকে নিষেধ করা হইয়াছিল, তাহারা যেন টাকা লগ্নি করিয়া অন্য ইহুদীর কাছ হইতে সুদ গ্রহণ না করে। তবে অ-ইহুদীদের কাছ হইতে সুদ গ্রহণ করার অনুমতি ছিল (যাত্রা-২২ঃ২৫, লেবীয়-২৫ঃ৩৬-৩৭; দ্বিতীয় ২৩ঃ ১৯-২০)। কিন্তু তাহারা এই নীতি (আইন) ভঙ্গ করিয়া ইহুদীদের কাছ হইতেও সুদ গ্রহণ করিতে লাগিল (নহূম-৫ঃ৭)। পরে তাহারা নেহেমিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, তাহারা এই পাপাচার পরিত্যাগ করিবে (নহূম-৫ঃ১২)। কিন্তু আবার তাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল। তাই যিহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণী (যিহিস্কেল-১৮ঃ১৩) অনুযায়ী, ইহুদীরা জাতিসত্তা হিসাব মৃত্যুবরণ করিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হইবার জন্য বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছড়াইয়া পড়িল।

৭০৪। ইহা ঐসব জ্ঞানীগুণী ইহুদীদিগকে বুঝাইয়াছে, যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। 'মু'মিনগণ' শব্দটিও এই জন্যই যোগ করা হইয়াছে যাহাতে ঐসকল ইহুদীদিগকেই এই আয়াতের লক্ষ্য বলিয়া মনে করা হয় যাহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছে।

৭০৫। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'মুকিমুনা'-এর স্থলে 'মুকিমীনা' ব্যবহার করা নীতি-সিদ্ধ। বিশেষ জোর দিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়া থাকে (কাশ্শাফ, ১ম ৩৩৬)।

৭০৬। এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে কয়েকজন নবীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, এই কথা বুঝাইবার জন্য যে, ইসলামের নবী (সাঃ)-এর আগমনও তাহাদের মতই স্বাভাবিকভাবে হইয়াছে। দাউদ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ প্রজ্ঞাপূর্ণ 'যবূর কিতাব' এবং পরবর্তী আয়াতে উল্লেখকৃত মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ শরীয়ত পূর্ণ কিতাবের প্রতি এই কারণে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, যেহেতু মহানবী (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ 'কুরআন'ও প্রজ্ঞা ও শরীয়ত এই উভয় গুণেই পরিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধ।

৭০৭। কুরআন মাত্র ২৪ জন নবীর নাম উল্লেখ করিয়াছে, অথচ নবী করীম (সাঃ)-এর এক হাদীস অনুযায়ী ১ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর আসিয়াছেন (মসনদ, ৫ম, ২৬৬)। কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে, "এমন কোন জাতি নাই, যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই" (৩৫ঃ২৫)।

৭০৭-ক। অনুবাদে যাহা লিখা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও এই বাক্যটির অন্য অর্থ ইহাও হয়– মূসার সাথে আল্লাহ্, বিশেষভাবে বা সরাসরি বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।

১৬৬। (এবং প্রেরণ করিয়াছি) রসূলগণকে, শুভ সংবাদ বহনকারী এবং সতর্ককারী৭০৮ রূপে যেন রসূলগণের (আগমনের) পরে মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন ওযর-আপত্তি না থাকে।৭০৯ এবং আল্লাহ্‌ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৬৭। কিন্তু আল্লাহ্‌ ইহা (এই ঐশীবাণী) দ্বারা, যাহা তিনি তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন, সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ইহাকে নিজ জ্ঞানে৭১০ পরিপূর্ণ করিয়া নাযেল করিয়াছেন এবং ফিরিশ্‌তাগণও সাক্ষ্য দিতেছে; প্রকৃতপক্ষে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

১৬৮। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র পথে (লোকদিগকে) বাধা দেয়, অবশ্যই তাহারা চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।

১৬৯। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে এবং যুলুম করে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবে না এবং তিনি তাহাদিগকে কোন হেদায়াতের পথ দেখাইবেন না;

৭০৮। "শুভ সংবাদ বহনকারী ও সতর্ককারী" শব্দ দুইটি, নবীগণের দুইটি অপরিহার্য কর্তব্য ব্যক্ত করিতেছে। তাহাদের অনুসারীদিগকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁহারা এই সুসংবাদ দান করেন যে, তাহারা ইহজগতেও উন্নতি লাভ করিবে এবং পরকালেও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তিতে থাকিবে। যাহারা নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করে, নবীগণ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, প্রত্যাখ্যানকারীরা এমন দুঃখ-যন্ত্রণা ও আপদ-বিপদের সম্মুখীন হইতে যাইতেছে, যাহা হইতে তাহারা কোনমতেই রেহাই পাইবে না।

৭০৯। আল্লাহ্‌ মানুষের কাছে এই জন্যই নবী পাঠাইয়া থাকেন, যাহাতে শাস্তি প্রাপ্তির সময় সে এই আপত্তি উত্থাপন করিতে না পারে যে, তাহার দোষ-ত্রুটি ও পাপকর্ম দেখাইয়া দিবার জন্য এইগুলি হইতে বিরত না হইলে গুরুতর শাস্তি পাইতে হইবে বলিয়া সতর্ক করার জন্য, কেহই তাহার কাছে আসে নাই (২০ঃ১৩৫)।

৭১০। কুরআনের মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও চিরসত্যের এমন এক অফুরন্ত ভাণ্ডার রাখিয়া দিয়াছেন, যাহা নিজেই সাক্ষ্য বহন করিবে যে, এই কুরআন নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র বাণী কুরআনের বহুমুখী জ্ঞান-গরিমা ও সর্ব-সুন্দর গুণাবলী তর্কাতীতভাবে চিন্তাশীলদের কাছে প্রমাণ করে যে, ইহা ঐশী, লৌকিক নহে। (ক্রমশঃ)

হাদীস শরীফ

দোয়া

কুরআন : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

অর্থাৎ, এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন বল, আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে (সূরা আল্‌ বাকারা : ১৮৭)।

হাদীস :

اللهم باسمك الطاهر الطيب المبارك الاحب اليك الذى اذا دعيت به اجبت و اذا سئلت به اعطيت و اذا استرحمت به رحمت و اذا استفرجت به فرجت –

অর্থাৎ আল্লাহ্‌! তোমাকে তোমার পবিত্র, তৈয়্যব, মুবারক ও সবচে' প্রিয় নামের দোহাই দিচ্ছি, যখন এ নাম নিয়ে তোমাকে ডাকা হয় তখন তুমি সাড়া দিয়ে থাকো। আর যখন এই নামের দোহাই দিয়ে তোমার কাছ থেকে চাওয়া হয় তখন তুমি দান করে থাকো আর যখন এই নামের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে করুণা প্রার্থনা করা হয় তখন তুমি করুণা করে থাকো আর যখন এই নামের দোহাই দিয়ে কোন বিপদ দূর হবার জন্যে দোয়া করা হয় তখন তুমি তা কবুল করে থাকো (সুনানে ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : আলাহ্‌তাআলা মানবজাতিকে তাঁর পথে পরিচালিত করার জন্য নবীদের প্রেরণ করেছেন। এ সকল নবীদের কাজ একটাই ছিল–স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির অর্থাৎ মানবের সম্পর্ক করে দেয়া। খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবার দৃষ্টান্ত আমরা যুগে যুগে দেখে আসছি। এ সম্পর্ক নিবিড় ও গভীর হবার উত্তম মাধ্যম হলো দোয়া। খোদাতাআলা বলেন, তোমরা যদি আমাকে পেতে চাও ডেকে তো দেখ, আমি সাড়া দেবো। অর্থাৎ দোয়া বা প্রার্থনা করার মাধ্যমে আমরা খোদার জ্যোতিঃ দেখতে পাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো খোদাকে ডাকবো কীভাবে? কীভাবে ডাকলে তার উত্তর পাবো। এ ব্যাপারে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, খোদাকে তাঁর গুণবাচক নাম নিয়ে ডাকো। তাঁর গুণবাচক নাম নিয়ে ডাকার অর্থ হলো সেই গুণাবলী নিজের মধ্যেও সৃষ্টি কর। ইবনে মাজার যে হাদীসটি লেখা হয়েছে আসলে ইহা এমন একটি দোয়া বা হৃদয়ের গহীন হতে নির্গত হলে কবুল হবে। এই দোয়ার কথাগুলি উচ্চারণ করে দোয়া করলে খোদাতাআলা দোয়া কবুল করবেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, খোদাতাআলা মালিক। এটা তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি দোয়া কবুল করবেন কি না। তবে আমাদের কাজ তাঁর কাছ থেকে চাওয়া। তিনি বড়ই আত্মমর্যাদাভিমানী। তিনি বলেন, "আমি আমার এমন বান্দাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে বড়ই লজ্জাবোধ করি যে আমার সামনে হাত পাতে।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদের জীবিত খোদার স্মরণ করাতে এসেছেন। তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাতে এসেছেন। তাই আমাদের উচিত আমরা যেন খোদার সামনে উপস্থিত হই। মিথ্যা খোদাকে পরিহার করে সত্য ও জীবিত খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। আর এর জন্যে আমাদের দোয়াকারী হতে হবে। খোদাকে ডাকতে হবে। আর এই ডাকার উত্তম পন্থা হলো, খোদার সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেভাবে যে ভাষায় যে কথা উচ্চারণ করে ডেকেছেন আমরাও যেন সেভাবেই তাঁকে ডাকি। আল্লাহ্‌ করুন এ যুগের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও অপরাজেয় অস্ত্র দোয়া যেন আমাদের প্রত্যেকের অস্ত্র হয়। আমীন (পুনঃপ্রকাশিত)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

অমৃত বাণী

বরাহীনে আহমদীয়া

মূল: হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)

প্রত্যেক যুগেই বহুবিধ অলীক ধর্ম বিশ্বাস এবং বিকৃত ও অনিষ্টকর ধ্যান-ধারণা পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করিয়া এবং নিত্যনূতন বেশ-বিন্যাস পরিধান করিয়া জন্ম নিয়া থাকে, তখন খোদাতাআলা সেইগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ও খণ্ডন করার জন্য এই চিকিৎসা-পদ্ধতিই প্রবর্তন করিয়াছেন যে, সেই যুগেই এমন রচনাবলী সরবরাহ করাইয়া দেন যেইগুলি তাঁহার বাণীর জ্যোতিঃ অবলম্বন করিয়া পূর্ণ শক্তির সহিত ঐসব ধ্যান-ধারণা খণ্ডন ও প্রতিহত করার জন্য রুখিয়া দাঁড়ায় এবং শত্রুদিগকে অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা নিরুত্তর ও আপত্তির পাত্র বলিয়া সাব্যস্ত করে। কাজেই এইরূপ ব্যবস্থাপনা দ্বারা ইসলামের চারাগাছ সর্বদা সতেজ, সজীব এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হইতে থাকে।

হে ইসলামের সম্মানিত বুযুর্গবৃন্দ! ইহার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আপনারা সকল বন্ধু আপনাদের অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে পূর্ব হইতেই বর্তমান যুগের অসৎকার্যাবলী সম্বন্ধে অবশ্যই অবগত আছেন যেগুলি বর্ণনা করা খুবই পীড়াদায়ক ও দুঃখজনক। আপনাদের নিকট ইহা গোপনীয় নহে যে, মানুষের প্রবৃত্তিতে কতই না বিশৃঙ্খলা ও গর্হিত স্বভাব প্রবেশ করিতেছে আর কত প্রকারেই না মানুষ অপহরণ, পথভ্রষ্টতা ও কুধারণার শিকারে পরিণত হইয়া নীতিবিচ্যুত হইতেছে। এই সব ঘটনা ঘটিতেছে ইহারই ফলশ্রুতিতে যে, অধিকাংশ লোক ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি সম্বন্ধে অনবহিত। যদিও কিছুসংখ্যক শিক্ষিত লোকও আছে কিন্তু তাহারা এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং স্কুল-মাদ্রাসা হইতে শিক্ষা অর্জন করিয়া থাকেন যেখানে ধর্মীয় জ্ঞান আদৌ শিক্ষা দেওয়া হয় না এবং তাহাদের উপলব্ধি করার, অনুধাবন করার চিন্তা-ভাবনা করার এবং দূরদর্শিতার সহিত লক্ষ্য করার সুবর্ণ কালটি অন্যান্য জ্ঞান ও কলাকৌশল শিক্ষা লাভে অতিবাহিত হইয়া যায় এবং ধর্মের পথ সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিকট অচেনা থাকিয়া যায়। সুতরাং যদি ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি সম্বন্ধে তাহাদিগকে ত্বরিত অবহিত না করা হয় তাহা হইলে এইসব লোক হয়তো সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার পোকায় পরিণত হইয়া যায়, যাহারা ধর্মের কোন পরোয়া করে না অথবা তাহারা নাস্তিকতা এবং ধর্মচ্যুতির পোষাক পরিধান করিয়া ফেলে। আমার এই উক্তি কেবল ধারণা-ভিত্তিক ও আনুমানিক নহে; বড় বড় ভদ্র পরিবারের সন্তানদিগকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যাহারা খৃষ্টীয় ধর্মে অবগাহিত হইয়া গির্জায় বসিয়া আছে। যদি পরম রক্ষাকারী আল্লাহ্‌র অশেষ ফযল ইসলামের সাহায্যকারী ও সহায়ক না হইত এবং তিনি আলেমবৃন্দ ও জ্ঞানী-গুণীমণ্ডলীর জোরালো বক্তৃতাসমুদয় ও রচনাবলী দ্বারা এই সত্যধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ না করিতেন তাহা হইলে অল্পকাল পরেই দুনিয়ার পূজারীগণ এতটুকুও জানিত না যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া এই ফিৎনা ও বিপর্যয়পূর্ণ যুগে, যখন চতুর্দিকে কুচিন্তা ধারারই প্রাদুর্ভাব। যদি ইসলাম ধর্মের অভিজ্ঞ গবেষকগণ যাহারা পরম বীরত্বের সহিত এবং দৃঢ় মনোবল সহকারে প্রত্যেক অবিশ্বাসী ও নাস্তিকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রহিয়াছেন, যদি তাহারা তাহাদের এই সেবা পালন হইতে বিরত ও নীরব থাকেন তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই ইসলামী রীতিনীতি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে যে, সুন্নত কর্তৃক বিধিবদ্ধ সালামের পরিবর্তে 'গুডবাই' এবং 'গুডমর্নিং' শব্দই শুনা যাইবে। সুতরাং এহেন দুঃসময়ে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কীয় দলীল-প্রমাণাদি প্রকাশ ও প্রচারের শুভ কাজে আন্তরিকভাবে রত থাকা বস্তুতঃপক্ষে নিজেদেরই সন্তান-সন্ততি এবং নিজেদেরই বংশধরদের উপর দয়া প্রদর্শন করার প্রকারান্তর। কেননা, যখন মহামারীর বিষাক্ত বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে তখন উহার প্রতিক্রিয়া প্রত্যেকের জন্যই বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়।

হয়তো কোন কোন বন্ধুর মনে এই সন্দেহ রেখাপাত করিতে পারে যে, এখন পর্যন্ত ধর্মীয় তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ঐগুলি কি বিরুদ্ধবাদীদের নিরুত্তর হওয়ার এবং আপত্তিখণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট নহে যে, ইহার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে? সুতরাং আমি তাহাদের অন্তরে এই কথাটি অঙ্কিত করিয়া দিতে চাই যে, এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থের উপকারসমূহের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ঐ গ্রন্থগুলি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় রচিত হইয়াছে এবং ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা ও দলীল প্রমাণাদি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ; যাহা ঐ বিশেষ সম্প্রদায়কেই কেবল দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। ঐ গ্রন্থগুলি যতই উত্তম এবং সূক্ষ্ম হউক না কেন ঐগুলি দ্বারা কেবল বিশেষ সম্প্রদায়ই লাভবান হইতে পারে যাহাদের মোকাবেলায় ঐগুলি সংকলিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থটি সকল সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় ইসলাম এবং ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতা ও যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে এবং ব্যাপক গবেষণামূলক দলীলাদির ভিত্তিতে কুরআন মজীদের সত্যতা চূড়ান্তরূপে প্রতীয়মান করে। বলা বাহুল্য যে, ব্যাপক আকারে গবেষণাক্ষেত্রে যত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ পায়, বিশেষ সীমিত বিতর্ক ক্ষেত্রে তত প্রকাশ পাওয়া আদৌ সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সহিত তর্ক-বিতর্ক করে তাহার জন্য ঐ সম্প্রদায়ের স্বস্বীকৃত বিষয়াবলীকেও নিজের গভীর ও দৃঢ় গবেষণার আলোকে প্রতীয়মান করার কোন প্রয়োজন হয় না বরং বিশেষ সীমিত তক-বিতর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাল্টা অভিযোগমূলক উত্তর দ্বারাই কার্য সমাধা করা হয়; যুক্তিযুক্ত প্রমাণাদির প্রতি খুব কমই মনোযোগ দিতে হয়। এই প্রকারের বিশেষ সীমিত তর্ক-বিতর্কের ধরনধারণই এমন যে, দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে গভীর গবেষণা করার কোন প্রয়োজন হয় না। পূর্ণ-দলীল উপস্থাপনের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। যুক্তি-সঙ্গত দলীল-প্রমাণের যৎসামান্য অংশও উল্লেখ করা হয় না। যেমন আমরা যখন কোন এমন এক ব্যক্তির সহিত তর্ক করি যে, বিশ্ব-জগতের একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে, ওহী ইলহাম স্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টিগুণকে মান্য করে, সেইক্ষেত্রে কি আমাদের জন্য আবশ্যক হয় যে, তাহার সম্মুখে আমরা যুক্তিপ্রমাণ দাঁড় করিয়া সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত করি অথবা ওহী-ইলহামের প্রয়োজনীয়তার কারণ দর্শাইতে আরম্ভ করি অথবা আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টিগুণের জন্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করি; বরং ইহা বৃথা কাজ হইবে যে, যে বিষয়ে কোন কলহ নাই সেই বিষয়কে নিয়া কলহবিবাদ আরম্ভ করিয়া দিই। কিন্তু যে ব্যক্তি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস, বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গী, বিভিন্ন আপত্তি এবং বিভিন্ন সন্দেহের সম্মুখীন হয় তখন গভীর গবেষণার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি বাকী থাকে না।
(ক্রমশঃ)

অনুবাদ–মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

হাকীকাতুল ওহী

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

ইহা ছাড়া আমার ওপর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে আরো একটি ইলহাম তাহার পুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠায় মজুদ আছে। তাহা এই যে, "এই মিথ্যা রচনাকারীর উপর অর্থাৎ এই মিথ্যা রচনাকারীর নাকের উপর বা মুখের উপর আমি আগুনের দাগ লাগাইব, অর্থাৎ তাহাকে প্লেগে ধ্বংস করিব, বা তাহাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করিব। এই তীর যাহা তুমি (হে এলাহী বক্স!) চালাইয়াছ তাহা তুমি চালাও নাই, বরং খোদা চালাইয়াছেন।" অতঃপর ৯ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে এই ইলহাম লিখিয়াছে, তোমার আয়ুকে লম্বা করিয়া এবং পৃথিবীতে তোমাকে দীর্ঘকাল রাখিয়া তোমার লম্বা আয়ু দ্বারা মুসলমানদের অনেক উপকার করিবেন।" কিন্তু ইহার পর বাবু এলাহী বক্স মাত্র ছয় বৎসর পর্যন্ত জীবিত রহিল। ইহা হইল লম্বা আয়ুর ইলহাম। ইহার পর এই লেখা আছে, "আমার উপর যে, খেদমত সোপর্দ করা হইয়াছে তাহ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চয় মরিব না" বাবু এলাহী বক্স সাহেবের পুস্তক "আসায়ে মূসা" দেখার পর জানা যাইবে যে, সে এই পুস্তক প্রণয়নের ৬ (ছয়) বৎসর পর মরিয়া গেল। এখন ন্যায় বিচারকগণ নিজেরাই বুঝিতে পারেন যে, লম্বা আয়ু ও দীর্ঘস্থিতি এর অর্থ কি ইহাই যে, সে তাহার কোন সফলতা না দেখিয়াই মাত্র ছয় বৎসরে প্লেগে শেষ হইয়া গেল এবং আক্ষেপের সহিত আমার জীবদ্দশাতেই ব্যর্থ হইয়া মরিয়া গেল? আমি এখন তাহার সম্পর্কে কেবল তাহার বন্ধুদের মতামত জানিতে চাহিতেছি। আমি বিনয়ের সহিত নিবেদন করিতেছি, ইহা কি সঠিক যে, তাহার ইলহামের আলোকে এই দাবী করিয়াছিল যে, তাহার উপর যে খেদমত সোপর্দ হইয়াছে তাহা যতদিন পূর্ণ না হয় সে কখনো মরিবে না, সে খেদমত কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে? তাহার সকল প্রচেষ্টা এবং তাহার সকল অপবাদ, যাহা সে তাহার পুস্তক "আসায়ে মূসা"তে আমার বিরুদ্ধে লাগাইয়াছে, ঐগুলি কি আমার একটি কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিয়াছে? পাঠকগণ আমাকে এই কথা বলারও অনুমতি দিন যে, ইহা কি সত্য নহে যে, বাবু এলাহী বক্স সাহেব আমার সম্পর্কে যে ইলহাম- অর্থাৎ নাকে বা মুখে আগুনের দাগ-করিয়াছিল তাহা উল্টিয়া গিয়া তাহার উপরই পড়িয়াছিল? কুদরতের হাত এইভাবে তাহার নাকে বা মুখে প্লেগের আগুনের দাগ লাগাইল যে, তাহার পরিসমাপ্তিই ঘটাইয়া দিল এবং মা রামাইতা (অর্থঃ-যাহা তুমি নিক্ষেপ করিয়াছ- অনুবাদক)-এর তীর যাহা সে তাহার ইলহাম অনুযায়ী আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, অবশেষে উহা তাহার উপরেই লাগিয়া গেল।

এলাহী বক্সের ইহা কীরূপ তীর ছিল যে, অবশেষে উহা তাহার নাককে চিরিয়া দিল? তাহার অভিসম্পাত তাহারই উপর পতিত হইল। এই রহস্য কি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিবে? অহংকারের দ্বারা ঐ প্রিয় খোদাকে পাওয়া যায় না। বিনয় দ্বারাই প্রিয় খোদাকে পাওয়া যায়। যে ঐ পবিত্র খোদার সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে, তিনি তাহাকে পবিত্র করিবেন। তখন সে তাঁহাকে পাইবে। তিনি বিনয় পসন্দ করেন। খোদার দরগাহে যাওয়ার পথই হইল বিনয়। ঐ অহংকারী ও পথভ্রষ্ট অদ্ভুত বোকা, যে নিজের আত্মাকে পথহারা করিয়াছে। তাহার দৃষ্টি সর্বদা অন্যের মন্দ কর্মের প্রতি থাকে; কিন্তু সে নিজের মন্দ কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত।

অতঃপর "আসায়ে মূসা" পুস্তকের ১৫২ পৃষ্ঠায় বাবু এলাহী বক্স সাহেব আমার সম্পর্কে এই ইলহাম প্রকাশ করিয়াছে, ইহা ১৩১৭ হিজরী সালের ঘটনা। এই ব্যক্তি কাফের মরিবে। তাহার সহিত আমার পারস্পরিক অভিসম্পাত অর্থাৎ তাহার সহিত আমার মোবাহালার কুপ্রভাব তাহার উপরই পড়িবে এবং মুত্তাকীদের (খোদা-ভীরুদের) জন্য বেহেশ্ত নিকটবর্তী। এই ইলহামের মূল বিষয় এই যে, বাবু এলাহী বকস সাহেব মুত্তাকী এবং আমি কাফের। তাহার সহিত আমার যে লা'নাত উল্লাহে আলাল কাযেবীন (অর্থঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত-অনুবাদক) অর্থাৎ- মোবাহালা হইয়াছিল, ঐ অভিসম্পাত তাহার ইলহামের দরুন আমার উপর পড়িবে এবং সে সকল বিষয়ে সফলকাম হইয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য, লে'আন (অভিসম্পাত) আরবী ভাষায় মুলায়েনাহ্ (অভিসম্পাত)কে বলা হয়। লেসানুল আরবে লেখা আছে, এই শব্দ দুইটির অর্থ এই যে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একে অন্যকে অভিসম্পাত দিবে। ইহা ছাড়া এই পুস্তক লেসানুল আরবেই লেআন এর এই অর্থ লেখা আছে। অভিসম্পাতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক নেকী, ধন-সম্পদ, বরকত ও কল্যাণ হইতে কাউকে বঞ্চিত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত অভিধানে ইহার অন্য অর্থ এই লেখা আছে,

(১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টীকা ঃ যদি কেহ এই সন্দেহ করে যে, বাবু এলাহী বক্সের এই সকল ইলহাম যাহা সে "আসায়ে মূসা" তে লিখিয়াছে, কীভাবে জানা যাইবে এইগুলি সে এই গ্রন্থকারের জন্য লিখিয়া গিয়াছে তবে বলা বাহুল্য বাবু এলাহী বক্স এই "আসায়ে মূসা" পুস্তকটি বিশেষভাবে আমার বিরুদ্ধে বৈরী হামলা করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করিয়াছে। আমাকে প্রত্যাখ্যান ও অবমাননা করা ছাড়া এই পুস্তকটি প্রনয়নের আর কোন উদ্দেশ্যও ছিল না। বাবু সাহেব সর্বদা গোপনে আমার সম্পর্কে নিজের বন্ধুদের মধ্যে এইরূপ ইলহাম প্রচার করিত, যেগুলির সারমর্ম এই ছিল যে, যেন আমি মিথ্যাবাদী, কাফের ও ফেরাউন এবং সে মূসা এবং আমি শীঘ্র তাহার মাধ্যমে এবং তাহার ইসলামের আলোকে খোদার আযাবে নিপতিত হইয়া যাইব। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "আসায়ে মূসা" পুস্তকের ২,৪,৬,৭,৮ও৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে বাবু এলাহী বক্সের সহিত তাহার বৈরী ইলহামগুলি সম্পর্কে আমার পত্রালাপ হইয়াছিল। "আসায়ে মূসা" এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পত্রে, আমি বাবু সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম যে, আপনি আমার সম্পর্কে যে পরিমাণে প্রত্যাখ্যানের ইলহাম প্রচার করিতেছেন এবং কেবল মুখে মুখে আপনার বন্ধুদিগকে শুনাইতেছেন ঐগুলি কসম খাইয়া প্রকাশ করিয়া দিন, যাহাতে আপনার ঐ সকল ইলহাম যদি মিথ্যা রচনা হয় তবে খোদাতাআলা মিথ্যার শাস্তি দিবেন। এই পত্রের উত্তর তিনি যাহা দিলেন তাহা তাহার পুস্তকের ৪র্থ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। ইহার সারসংক্ষেপ এই যে, কসম খাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। যদি আমি খোদা সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করিয়া থাকি তবে তিনি কসম ছাড়াও আমাকে শাস্তি দিবেন। আমি ইলহামগুলি প্রকাশ করিয়া দিব। ইহার জবাবে ৭ম পৃষ্ঠায় আমার তরফ হইতে এই লেখা আছে যে, আমি কেবল খোদার নিকট সঙ্কটমুক্তি চাহিব যাহাতে ঐ সকল লোক যাহারা আমাকে সীমালংঘনকারী মিথ্যাবাদী নাম দিয়া থাকে এবং ঐ সকল লোক যাহারা আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলিয়া মানে তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্তাআলা নিজেই ফয়সালা করিবেন।

জুমুআর খুতবা

তাকওয়া ও ঈমানের প্রকৃত মর্মকথা

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ ইং মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের ১৮৬নং আয়াত তেলাওয়াত করেন।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

অতঃপর হুযূর (আইঃ) বলেন "কুল্লু নাফসিন্ যায়েকাতুল মওত" প্রত্যেক প্রাণ অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। প্রত্যেক প্রাণের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে যে, সেটি মৃত্যুর স্বাদ নিবে। "ওয়াইন্নামা তুওয়াফ্ফাওনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামা" এবং তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান কেয়ামতের দিনে দেয়া হবে। এটির অর্থ এখানে এই নয় যে, এই পৃথিবীতে (ঐ কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে না। 'তুওয়াফ্ফাওনা'-এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক দিক থেকে সর্বোচ্চ পরিপূর্ণ প্রতিদান কেয়ামতের দিনে দেয়া হবে। 'ফামান যুহ্যেহা আনিন্ নারে'–সুতরাং যাকে অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। 'ওয়াউদখিলাল জান্নাতা এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। 'ফাকাদফাযা'–সুতরাং নিশ্চিত সে সফলকাম হবে। "ওয়ামাল হাইয়াতুদ দুন্ইয়া ইল্লা মাতা'উল গুরুর" –আর পার্থিব জীবন তো একটি প্রতারণার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এই আয়াতে করীমা জীবন এবং মৃত্যুর দর্শন বর্ণনা করছে। "কুল্লু নাফ্সিন যায়েকাতুল মওত"–প্রত্যেক সেই সত্তা যার প্রাণ রয়েছে, তাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। এতে প্রত্যেক জীব, মানুষ এবং প্রাণের অধিকারী সত্তাসমূহ অন্তর্ভুক্ত। সে সকল লোককে প্রতিদান দেয়া হবে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে যে সকল উদ্ধৃতি আমি পড়ছি এবং বিগত খুতবায়ও একটি উদ্ধৃতি অসমাপ্ত ছিল, সময় শেষ হওয়ার কারণে রয়ে গিয়েছিল, এখন আমি ঐ জায়গা থেকেই বিষয়টি শুরু করছি। ঐ বাক্য যা পূর্বেও পড়া হয়েছিল, কিন্তু ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য সেটি পুনরায় পড়ছি। "দেখ, চিকিৎসক (রোগের) ঔষধ সনাক্ত করে নেয়। 'বানাফ্শা' "খেয়ার শম্বা' এবং 'তুরবতে' (এগুলি বিভিন্ন রোগের জন্য বনষ্পতি হেকিমী ঔষধ) একটি দীর্ঘ পরীক্ষার পর যে গুণাবলী প্রমাণিত ঐ গুণাবলী যদি সেই ঔষধে না পাওয়া যায় তাহলে হেকিম সেগুলিকে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় ফেলে দেয়। তদ্রূপ ঈমানেরও এমন লক্ষণ রয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বারংবার এগুলি তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন"। পার্থিব জীবনে একজন হেকিম যখন পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত ঔষধাদিকে ক্রিয়াহীন দেখেন তখন তিনি সেগুলিকে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় ফেলে দেন। ঈমানেরও তদ্রূপ চিহ্নাবলী রয়েছে যা মানুষের কর্মে এবং হৃদয়ে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। যদি কেউ ঈমানের পানি পান করে আর তা ক্রিয়া না করে তাহলে খোদাতাআলা হেকিমের ন্যায় জ্ঞানও কি রাখেন না? তিনি কি জানেন না যে, এই ঈমান নোংরা এবং ত্রুটিপূর্ণ? আর তার মধ্যে ঈমানের গুণাবলীই নেই। ঔষধ নামের মাধ্যমে নয়, এবং গুণাবলীর মাধ্যমে পরিচিত হয়। **ঈমানও নিজ গুণাবলীর মাধ্যমে পরিচিত হয়, নামের মাধ্যমে নয়।** এটি হচ্ছে সেই বিষয়-বস্তু যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন। উদ্ধৃতির ঐ অংশ যা রয়ে গিয়েছিল, আমি আজ সেটি পড়ে শুনাচ্ছি। "এটি সত্য কথা যে, ঈমান যখন মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তার সংগেই আল্লাহ্তাআলার মাহাত্ম্য অর্থাৎ প্রতাপ, পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব, কুদরত এবং সবচেয়ে বড় বিষয় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-এর যথার্থ অর্থ (মানুষের হৃদয়ে) প্রবেশ করে।" এটি সহজ সাধারণ কথা বলে মনে হয়, যা প্রত্যেকের মধ্যে থাকা উচিত। সতিকারের ঈমান হলে আল্লাহ্তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না-এটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। এই একটি বাক্যের মধ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রত্যেক ধরনের পাপের উপর বীরত্বের দর্শন বর্ণনা করে দিয়েছেন। এগুলির চিকিৎসা কেবল একটি আর তা হচ্ছে ঈমান। এই বিষয়-বস্তুটিকে আমি [মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর] অন্যান্য লেখার আলোকে আপনাদের সম্মুখে বর্ণনা করেছিলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন যে, যদি তুমি দেখে থাক যে, এই গতে সাপ রয়েছে, আর জান যে, এটি বিষাক্ত। উহা গর্তের সম্মুখে মাথা বের করে খানিকটা ভিতরে চলে যায় দৃশ্যতঃ ঐ সাপটি যত সুন্দরই হোক না কেন ইহা অসম্ভব যে, তুমি সেই গর্তে হাত দিবে। **ঈমানের যথার্থতা মানুষের আমলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যদি মানুষ জানত যে, আমার কর্ম আল্লাহতাআলাকে অসন্তুষ্ট করার কারণ, আর তাঁর (আল্লাহ্) গ্রেফতারী থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তাহলে পাপের উপর তার বীরত্ব দেখানো অসম্ভব হতো।** সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন যে, ঈমানের সংগে আল্লাহ্তাআলার মাহাত্ম্য বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ প্রতাপ, পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব, কুদরত এবং সবচেয়ে বড় বিষয় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর যথার্থ অর্থ মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে। অর্থাৎ তার মধ্যে আল্লাহ্তাআলা ছাড়া যেন আর কেউ না থাকে। এটি ইসলাম এবং ঈমানের সারাংশ। সারা জীবনের উত্থান-পতন কেন সৃষ্টি হয় তা এই উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। যখন মানুষ খোদাতাআলার নিকটতম হয় তখন যেন মনে করে, আমি সফলতা লাভ করেছি। আবার যখন খোদাতাআলা থেকে দূরে সরে যায় তখন সে মনে করে আমি বিফল হয়ে গিয়েছি। এইরূপ উত্থান-পতন জীবনে হয়ে থাকে। আপনি যদি নিজ স্বত্তায় চিন্তা করে দেখেন তবে দেখতে পাবেন যে, এগুলোর সম্পর্ক সবসময়

ঈমানের আওতার সংগে সম্পৃক্ত। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, যখন ঈমান স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন সত্যিকার অর্থে মানুষ সেই সময় উন্নতি করে থাকে আর পাপ থেকে সর্বাধিক দূরে থাকে। মানুষ যখন ঈমানের দাবী পূরণে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন সে একটি অন্ধকারের কবলে চলে যায়। সেখানে পাপ বিভিন্ন বেশে তার উপর আক্রমণ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরো উপদেশ আপনাদের সামনে রাখছি। এ উপদেশসমূহ তাঁর (আঃ) ভাষাতে স্বাদ পাওয়া যায়। আমি আমার ভাষায় অনুবাদ এ জন্য করে থাকি যে, আমাদের অনেক অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ আছে যাদের বুঝিয়ে না দিলে তারা এ কথাগুলি বুঝতে পারে না। তিনি আঃ) বলেন "এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ্তাআলা তার ভিতরে অবস্থান নেয়"। ঈমান হচ্ছে সেটি যা আল্লাহ্তাআলার অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। জগতে যে বিষয়ের উপর আপনার ঈমান থাকে উহার ধারণাও আপনার অভ্যন্তরে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। যে বিষয়ে ঈমান নেই সেই বিষয়ের ধারণা আপনার অভ্যন্তরে স্থান নিতে পারে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, ঈমান এমন কোন বিষয় নয় যা দূরের কল্পনা। আল্লাহ্র সত্তায় সত্যিকার ঈমান থাকলে আল্লাহ্ আপনার সত্তায় অবস্থান নিবেন। তিনি (আঃ) বলেন, "এবং শয়তানী জীবনের উপর একটি মৃত্যু নেমে আসে ও পাপের প্রবৃত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। এটি হচ্ছে ঈমানের লক্ষণ। সুতরাং তুরবত, বানাফশা (বনস্পতি হেকিমী ঔষধ) অথবা অন্যান্য জিনিষের যেমন পরিচিতি রয়েছে তেমন ঈমানেরও একটি লক্ষণ হওয়া উচিত। **ঈমানের লক্ষণ হচ্ছে পাপের প্রবৃত্তি ধ্বংস হয়ে একটি নতুন জীবন আরম্ভ হয়ে যাওয়া।**

সেইটি আধ্যাত্মিক জীবন হয়ে থাকে অথবা এভাবে বল যে, আকাশ সৃষ্টির প্রথম দিন হয়ে থাকে। যেদিন মানুষ পৃথিবীতে নতুনভাবে জন্ম নেয়। তখন শয়তানী জীবনের উপর মৃত্যু আসে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা হয়। যেখানে শিশু জন্ম হয়ে থাকে। শিশুর জন্ম নেয়া মানুষের জীবনের এমন কাজ যার পুনরাবৃত্তি হয়। মানুষের আত্মা থেকে একটি শিশুর জন্ম নেয়। শিশুর জন্ম নেয়া ঈমানের কল্যাণে হয়ে থাকে। যদি ঈমান না থাকে তাহলে মানুষের জীবনে নতুন শিশু জন্ম নেবে না। এখন হযরত আকদস (আঃ)-এর উদ্ধৃতির পর কুরআন করীমের ঐ আয়াতের ব্যাখ্যার দিকে ফিরে আসিছ যা আমি আপনাদের সম্মুখে তেলওয়াত করেছি। কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মওত -প্রত্যেক আত্মাকে অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এখানে কেবল জাগতিক মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে না বরং অন্য আরেক প্রকারের মৃত্যুর কথাও বলা হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি হয় শয়তানের হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে নতুবা আল্লাহ্তাআলার উদ্দেশ্যে নিজেই নিজেকে উৎসর্গ করবে। এ দু'টি সম্ভাব্য মৃত্যুই রয়েছে যা আধ্যাত্মিক জীবনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং কুল্লু নাফসিন্ যায়কাতুল মওত-এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি হয় পৃথিবীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং শয়তানের হাতে মৃত্যুবরণ করবে নতুবা যেভাবে ইব্রাহীম (আঃ) নিজের নাফসের উপর ছুরি চালিয়ে আল্লাহ্তাআলার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। সেভাবে ঐ ব্যক্তি নিজের সত্তার উপরে ইব্রাহীমের ন্যায় একটি মৃত্যু চাপিয়ে নিবে। এইটি অবধারিত বিষয়। কেউ এর বাইরে নয়- "ওয়া ইন্নামা তুওয়াফ্ ফাওনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামা-এটিতে শুভ সংবাদ রয়েছে যে কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। অথচ ইতোমধ্যে নতুন জীবনের আকারে এ পৃথিবীতে প্রতিদান পেয়ে থাকে। যদি এইরূপ না হয় তাহলে কেয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ প্রতিদান পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। নতুন জীবন লাভ করা যদি শয়তানী সৃষ্টি হয় অর্থাৎ শয়তানী মৃত্যুর কারণে বাহ্যতঃ জীবন লাভ হয় তথাপি এর পরিপূর্ণ প্রতিদান কেয়ামতের দিন দেয়া হবে। এছাড়া যদি খোদাতাআলার উদ্দেশ্যে রূহানী মৃত্যু হয়ে থাকে তবে ঐ মৃত্যুর পর অবশ্যই রূহানী জীবন অবধারিত। আর এর পরিপূর্ণ প্রতিদানও কেয়ামতের দিন দেয়া হবে। তাদের পরিচয় হবে এই-'ফামানযুহ্যেহা আনিন্নারে ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাযা অর্থাৎ সেই সময় যাকে অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে তারাই সফলকাম হবে। 'ফাকাদ ফাযা'-এর অর্থ হচ্ছে নিশ্চই সফলকাম হবে। তার সফলতার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি বর্ণনা করার পর এই সতর্কবাণী রয়েছে- "ওয়ামাল হাইয়াতুদ্ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর" প্রতারণার জীবন, প্রতারণার সামগ্রী যাতে তোমরা নিমজ্জিত, এ পৃথিবীতে প্রতারণা লাভ ছাড়া যে লাভ দেখা যায় তা-ও বাস্তবে প্রতারণাই হয়ে থাকে। এগুলো ছাড়া এ জীবনের আর কোন বাস্তবতা নেই সুতরাং এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাই ছিল যা মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করছিলেন। এ আয়াতের সঙ্গে এ বিষয়টির একটি গভীর অটুট বন্ধন রয়েছে। এই কথাগুলো অত্যন্ত লোভনীয় যা মানুষের হৃদয়ে আকাঙ্খা সৃষ্টি করে যেন আমি ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হই যারা এ পৃথিবীতে নতুন জীবন লাভ করে। অনুরূপভাবে কেয়ামতের দিন যেন আমাকে অগ্নি থেকে দূরে রাখা হয়। অগ্নি থেকে দূরে রাখাও ঈমানের একটি প্রত্যাশা। অগ্নির উপর যার ঈমান নেই তাকে অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে না। যার এই বিশ্বাস নেই যে, যে অগ্নির কথা আল্লাহ্তাআলা বলছেন, তা অবশ্যই প্রজ্জ্বলতি করা হবে। অগ্নির উত্তাপ এবং প্রজ্জ্বলনের যার অভিজ্ঞতাই নেই আর যদি অভিজ্ঞতা থেকেও থাকে তাহলে সে হেয়ালী চোখে দেখে এবং অমনযোগী হৃদয় অনুভব করে। এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিনে অগ্নিকে দেখবে। "ওয়াহুয়া উদখিলান্নার"-এবং তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং এই ঈমানও আবশ্যক যে, যেভাবে জান্নাত সত্য অনুরূপভাবে জাহান্নামও সত্য। কুরআনের এই কথাগুলোর উপর যার বিশ্বাস রয়েছে যে, এগুলো সত্য, সে অবশ্যই অগ্নি থেকে দূরে যেতে আরম্ভ করবে। তার বাকী জীবন অগ্নি থেকে পরিত্রাণের একটি যাত্রা হবে। তার প্রত্যেক কর্ম যা সে সম্পাদন করে তাতে ভেবে দেখবে যে, কোথাও তার এই কর্ম তাকে অগ্নির নিকট নিয়ে যাচ্ছে কি না? যদি সে চিন্তা করে, সজাগ থাকে আর জেনে নেয় যে, তার এই কর্ম তাকে অগ্নির নিকটে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সে পৃথিবীতে অগ্নির নিকটবর্তী হওয়ার অভিজ্ঞতাকে দৃষ্টিপটে এনে বুঝবে যে, কোন্ শাস্তির নাম অগ্নি এবং কোন্ বিপদকে অগ্নি বলা হয়? কেয়ামতের দিন যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হবে তা পৃথিবীর অগ্নি থেকে ভয়ঙ্কর হবে। সেই (পৃথিবীর) অগ্নির অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে যদিও আমরা তা অমনযোগী অবস্থায় লাভ করে থাকি। এই বিষয়াবলীকে স্মরণ রাখার পদ্ধতি কী? এই বিষয়াবলী থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি কী? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে তা খোদার ভয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি খোদাতাআলাকে পরাভব এবং সর্বশক্তিমান মনে করে সে তাঁর ভয়েই দিন কাটাবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আল্লাহ্তাআলা মুত্তাকীদের (খোদা-ভীরুদের) ভালবাসেন। আল্লাহ্তাআলার মাহাত্ম্যকে স্মরণ করে সবাই ভীত থাকে। স্মরণ রাখ

যে, সবাই আল্লাহ্‌তাআলার দাস।" এই কথাগুলো কত সরল, মনোরম এবং প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা! এমন বাস্তব যা হৃদয়ে স্থান দেয়ার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌তাআলার মাহাত্ম্যকে স্মরণ করে ভীত থাক। স্মরণ রাখবে, সবাই আল্লাহ্‌তাআলার দাস। তোমাদের স্ত্রী, ভাই-বোন, স্বামী সকল আত্মীয়-স্বজন আর যারা অনাত্মীয় এবং অন্যান্য মানুষ সকলেই আল্লাহ্‌তাআলার দাস। এটি সেই চেতনা যা হৃদয় বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। এই চেতনাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে রূপান্তরিত কর। আল্লাহ্‌তাআলার মাহাত্ম্যকে স্মরণ করে সবই ভীত থাক। আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের ফলশ্রুতিতে দেখ যে, সবার উপর তোমার কি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? যে কেউ সামান্য শ্রেষ্ঠত্ব কারো উপর পেয়েছে তা আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ এবং মাহাত্ম্য ব্যতীত পাওয়া সম্ভবই ছিল না। এই চিন্তার ফলে মানুষ নিজের গুণাবলী এবং কর্তৃত্ব থেকে এক প্রকারের মুক্তি লাভ করে। তার শ্রেষ্ঠত্ব, পৃথিবীর কোন দরিদ্র বা ভাল ঘরে জন্ম নেয়া এই বিষয়মুখী তখন তার জন্য মানব জাতিতে কোন বিভেদ সৃষ্টি করে না। কেননা, তৌহীদ মানব জাতিতে কোন বিভেদ সৃষ্টি করতে দেয় না। আর এটিই খোদতাআলার মাহাত্ম্যের অর্থ। তাঁর মাহাত্ম্য যখন হৃদয়ে কর্তৃত্ব করে তখন প্রত্যেক মানুষ তাঁর কর্তৃত্বে এক সত্তায় রূপ নেয়। এতে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রশ্নই থাকে না। শ্রেষ্ঠত্ব আল্লহ্‌তাআলা দিয়ে থাকেন। মানুষ যদি এটিকে খোদাতাআলার সন্তুষ্টির গণ্ডির ভিতরে থেকে ব্যবহার করে তবে এতে কোন পাপ নেই। **শ্রেষ্ঠত্ব যখন গর্ব এবং অহংকারে রূপ নেয় তখন সে যতটুকু গর্ব এবং অহংকার করবে ততটুকু খোদাতাআলার মাহাত্ম্য তার থেকে কমে যায়। সেই সময় সেটি (আল্লাহ্‌তাআলার মাহাত্ম্য) তার উপর আর ছায়া করবে না।** "স্মরণ রাখবে, সবাই আল্লাহ্‌তাআলার দাস, কারো উপর যুলুম নির্যাতন করবে না।" যুলুমের ধারণা মানুষের হৃদয়ে সেই সময় সৃষ্টি হতে পারে যখন হৃদয়ে আল্লাহ্‌তাআলার মাহাত্ম্য থাকে না। আল্লাহ্‌তাআলা সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁর মাহাত্ম্য পূর্ণভাবে বিকশিত হলে মানুষ তখন কারো উপর যুলুম করার চিন্তা করবে–এটি কীভাবে সম্ভব?

"উগ্রস্বভাব প্রদর্শন করবে না, কাউকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে না।" যুলুমের পর এই 'তেযী' (উগ্রস্বভাব) শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা স্মরণ রাখার যোগ্য। যুলুম এবং উগ্রস্বভাব একটি অন্যটির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। (অন্তরে) যদি যুলুমের খেয়াল আসে আর মানুষ সেই খেয়ালকে অন্তর থেকে মিটিয়ে দেয় তবে এটি যুলুম নয়। যুলুমের সংগে যদি স্বভাবের উগ্রতা একত্রিত হয়ে যায়, একদিকে রাগ সৃষ্টি হলো আর ঐ দিকে রাগের মন্দ প্রভাব অন্য ব্যক্তির উপর প্রকাশ করে দেয়া হলো এটিকে তেযী (উগ্রস্বভাব) বলা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) শব্দ চয়নে বড় সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। অত্যন্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে একটি শব্দকে অন্য শব্দের সংগে গেঁথে দিতেন। "কারো উপর যুলুম করবে না, উগ্র স্বভাবও প্রদর্শন করবে না।" সাধারণ কোন ব্যক্তির মাথায় এ কথাটি আসতেই পারে না। এটি তত্ত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন সত্তার কথা। এখন আপনি উগ্র স্বভাবকে যুলুমের সংগে মিলিয়ে দেখুন তাহলে আপনি পৃথিবীর সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের দর্শন বুঝে যাবেন। প্রত্যেকটি বিশৃঙ্খলা যুলুম ও উগ্রস্বভাবের কারণে হয়ে থাকে। মানুষ যদি বিরত থাকে, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখায় খোদার ভয়ে এবং নিজের উগ্রস্বভাবকে সংবরণ করে, অর্থাৎ বিনয়ের সংগে উগ্র-স্বভাবকে দমন করে তাহলে পৃথিবী কলহ-বিবাদশূন্য হবে। সারা পৃথিবীতে উগ্রস্বভাবই রয়েছে যা (কলহ-বিবাদ সৃষ্টির জন্য) প্রদর্শন করা হচ্ছে। তুমি যদি আল্লাহ্‌র বান্দাদের (দর্শন) বুঝে থাক তবে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে না। যা দেয়া হয়েছে সেটিত আল্লাহ্‌র দান। তিনি যদি কাউকে ছোট করে সৃষ্টি করে থাকেন তবে তোমার কি অধিকার যে, এমন বান্দাদের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে? এমন বান্দাদেরকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। খোদাতাআলার ভয়কে স্মরণ করে চেষ্টা করা উচিত, তুমি জাগতিক যে প্রতিপত্তি পেয়েছে তা থেকে কিছু না কিছু দৃশ্যতঃ তুচ্ছ ব্যক্তিদের দিকে প্রবাহিত কর।" দেখ জামাতে যদি একটি ব্যক্তি অপবিত্র হয় তাহলে সে সারা জামাতকে অপবিত্র করে দেয়।" এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা যা আমরা বারংবার দেখেছি। যদি কোন নোংরা মাছ পুকুরে থাকে তাহলে ঐটি সেরূপ সমস্ত পুকুরকে নোংরা করে দেয়। তদ্রূপ অপবিত্র ব্যক্তি ভাল মানুষ ও পবিত্র জামাতের ভিতর অপবিত্রতা ছড়িয়ে দেয়। যখন কিনা তার (অপবিত্র ব্যক্তির) সংগে উঠা বসা করে তাকে তাদের মজলিসে শামিল করে তখন তারা অবশ্যই অপবিত্র হতে থাকে। এটির গভীর দর্শন হচ্ছে এই, এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌তাআলার মাহাত্ম্য নিজের ভিতর রাখে সে এমন ব্যক্তির নিকটেও যাবে না, যে অপবিত্র কথা বলে ও অপবিত্র জীবন যাবন করে। কখনো তাকে নিজেদের সভা-সমিতিতে বসতে দেবে না এবং আমন্ত্রণও করবে না। যদি কখনো কোন দাওয়াতে (অপবিত্র ব্যক্তিও) শামিল হয় তখন তার নিকটে না গিয়ে ভাল মানুষের সাথে যাবে। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও তখন তার (পবিত্র ব্যক্তির) মধ্যে কোন অহংকার সৃষ্টি হয় না বরং সাবধানতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাপকে গর্তে যেতে দেখে দূরে সরে গিয়েছ, এমন অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, তুমি বড় অহংকারী এইজন্য তুমি নির্বোধ সাপের সঙ্গে এমন আচরণ করছ। এমন চিন্তা করাকে যে অহংকার মনে করে সে নির্বোধ। **ধ্বংস এবং ধ্বংসের ব্যবস্থাপনার হাত থেকে আত্মরক্ষাকে অহংকার বলা হয় না। এগুলি সেই সাবধানতা যার অবলম্বন আবশ্যক। এইগুলি সেই সাবধানতা যা সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআন করীমে এসেছে।** অর্থাৎ যখন কোন সভা-সমিতিতে নোংরা আলোচনা করা হয়, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়দের সম্বন্ধে অবজ্ঞা-সূচক কথা বলা হয়। এমতাবস্থায় যদি তোমরা সত্যিকার মু'মিন হয়ে থাক তবে তৎক্ষণাৎ সেই সভা-সমিতি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া তোমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। এটিকে অহংকার বলা হয় না। যদি তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কথা বলে তবে স্থায়ীভাবে তাদের থেকে পৃথক হবে না। যখন তাদেরকে ভাল কথা বলতে দেখ তখন নিঃসন্দেহে তাদের সংগে সম্পর্ক রাখ। যদি পুনরায় তারা এমন বাজে কাজ করে তবে তোমাদের নিজেদেরকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য আবশ্যক যে, তোমরা তাদের থেকে সম্পক ছিন্ন কর। এটি কুরআনের বিষয়-বস্তু যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এখানে বর্ণনা করেছেন "কাউকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে না" এতদ্‌সত্ত্বেও যারা অপবিত্র তাদের এড়িয়ে চল। কেননা, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের সমস্ত সমাজকে অপবিত্র করে ফেলবে। সারা পৃথিবীতে এমন অনেক পরিবারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (দেখা গেছে) একজন ছেলে বা মেয়ে অপবিত্র মজলিসের সাথে উঠা বসা

করে, জামাতের নেযামের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখায় তা সত্ত্বেও মা-বাবা তাদেরকে আদরের সঙ্গে ডেকে ঘরে জায়গা দেয়। তারা তাদের অন্য সন্তানদের উপর বড় যুলুমকারী। তাদের (অপবিত্র সন্তানদের) থেকে পৃথক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাদের সংগে আপনার কোন ভালবাসার বন্ধন নেই। পৃথক হওয়ার অর্থ হচ্ছে ঐ সমস্ত সন্তান যারা রয়েছে তারা এবং আপনারা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের অধিকার আদায় করুন। এমনটি সম্ভব নয় যে, কোন ব্যক্তির সংগে এমন সম্পক রাখবেন যাতে তার বিষ আপনার শরীরে প্রবেশ করাবে। অনেকে কুকুরকেও আদর করে কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। সেটির বিষ যেন তাকে প্রভাবান্বিত না করে। কুকুরের দাঁতগুলি যেন তার মধ্যে ক্ষতের সৃষ্টি না করে। সুতরাং এটি হচ্ছে এখানে সাবধানতার বিষয়; কিন্তু মানুষ এটিকে বুঝে না। যার ফলশ্রুতিতে এমন ব্যক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে গোটা পরিবার নোংরা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তারা জামাত থেকে পৃথক হয়ে যায়। (জামাত) তাদেরকে পৃথক না করালেও তারা নিজেরাই পৃথক হয়ে যায়। এমন অনেক উদাহরণ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। এখানে (যুক্তরাজ্যে) আছে, আমেরিকায় আছে এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় এমন ঘটনা ঘটছে। আমি সব সময় এমন পরিবারকে ধীরে ধীরে জীবনের প্রবহমান ঝর্ণা থেকে পৃথক হয়ে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে দেখেছি। এটি এমন শয়তানী মৃত্যু যার পর আর কোন রূহানী জীবন নেই। সুতরাং আমি আশা রাখি আপনারা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই উদ্ধৃতিগুলিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখবেন, মনযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন এবং হৃদয়ে স্থান দিবেন। কেননা, **হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) থেকে উৎকৃষ্ট উপদেশ দানকারী আর কেউ কখনও জন্ম নেয়নি। এতে বিন্দু পরিমাণ কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।** এগুলি বাহ্যতঃ কতক শব্দ মাত্র কিন্তু এমন মনে হয় যেন দক্ষ কারিগরের কাজ। যিনি মাটি থেকে স্বর্ণ বানিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাক্যগুলিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখুন। এ বাক্যগুলির মধ্যে লেখার গুরুত্ব ততটা নেই যতটা মৌখিক কথাগুলির রয়েছে। যা তিনি উপদেশ আকারে বিভিন্ন সভা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে "মলফুযাত" নাম দিয়ে ছাপানো হয়েছে। যদি কেউ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর গভীর ব্যক্তিত্বকে সত্যিকার অর্থে চিনতে চায় তাহলে তর্ক সংক্রান্ত লেখাকে ছেড়ে দিয়ে মলফুযাতকে দেখা উচিত। **একজন মানুষ যদি গভীর মনযোগ সহকারে (সেই লেখাকে) পড়ে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভালবাসার সংগে চিন্তা করে তবে, মলফুযাতের একটি খন্ডই সারা জীবনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য যথেষ্ট বরং মলফুযাতের কয়েকটি লাইন এমন আছে যা সারা জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।**

"যদি এক ব্যক্তি নোংরা হয় তবে সবাইকে নোংরা করে দেয়। উষ্ণতার দিকে যদি তোমাদের স্বভাবের আকর্ষণ হয় তবে নিজেদের হৃদয়ে চিন্তা কর যে, এই উষ্ণতার উৎস কী?" অত্যন্ত প্রিয় ও গভীর উপদেশ। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে কোন কোন বিষয়ে তার ভিতর উষ্ণতা রয়েছে। উষ্ণতা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াদির সংগে সম্পর্ক রাখে। কতক ব্যক্তি তারা যদি চিন্তা করে তবে দেখতে পাবে যে, তাদের উষ্ণতা সাংসারিক ছিল খোদাতাআলার ভালবাসা নয়। জাগতিক উষ্ণতা কখনো সন্তানদেরকে উপদেশের আকারে বা কঠোরতা অবলম্বনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এটি ঐ সময় হয় যখন তারা দুনিয়া থেকে পৃথক হয় বা দুনিয়ার আয় উপার্জন থেকে পিছনে সরে আসে। যাদের হৃদয়ে ঐ সময়ে কঠোরতা সৃষ্টি হয় সেটি হচ্ছে উষ্ণতা। যদি তারা চিন্তা করে দেখে তবে তারা বুঝবে তাদের উষ্ণতা কেবল আল্লাহ্তাআলা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে ছিল। দুনিয়ার পিছনে চলার কারণে ছিল। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন–"দাঁড়াও এবং নিজের হৃদয়কে পরখ কর যে, এই উষ্ণতা কোন্ প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত হয়েছে"। যদি আল্লাহ্তাআলার প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে তবে এই উষ্ণতা ভিন্ন ধরনের হবে। এই উষ্ণতা অগ্নি থেকে রক্ষা করার উষ্ণতা, অন্য উষ্ণতা অগ্নিতে প্রবেশ করানোর উষ্ণতা। আপনার ভিতরে যখন উষ্ণতার সৃষ্টি হয় তখন আপনি এই একটি বাক্যের উপর চিন্তা করে নিজ হৃদয়কে বিশ্লেষণ করে দেখুন। অনেক সময় আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনার ক্রোধ আপনার আত্মাকে পিষ্ট করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। সন্তানদেরকে ছেড়ে অন্য বিষয়ে আমি আলোচনা করছি। কোন ব্যাপারে উষ্ণতার সৃষ্টি হলে ঐ উষ্ণতার সম্পর্ক অবশ্যই আত্মাকে পিষ্ট করার কারণে হয়ে থাকে। এটি খোদাতাআলার দৃষ্টিতে অভিশপ্ত উষ্ণতা এবং খোদাতাআলাকে ক্রোধান্বিত করার কারণ। আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টির সংগে এটির দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং নিজের হৃদয়কে পরখ সংক্রান্ত যে উপদেশ রয়েছে, আপনি যদি পরখ না করেন তবে বুঝতে পারবেন না যে, হৃদয়কে পরখ করলে কী হয়। যেখানে ছাই এর নীচে কয়লা এবং অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। দৃশ্যতঃ এটি ছাই যা এগুলিকে লুকিয়ে রেখেছে কিন্তু যদি আপনি পরখ করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, আসলে এগুলির ভিতর শয়তানী উষ্ণতা ছিল যা এক সময়ে মাথা চারা দিয়ে বাইরে এসেছে। অতএব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এই অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ"। সংকটপূর্ণ শব্দের উপর বাক্য শেষ করা নিজের সত্তায় একটি ভিন্ন গুরুত্ব বহন করে। যদি তুমি মনে কর যে, পরখ না করলে ক্ষতি কি? জীবন তো কেটেই যাচ্ছে। তিনি (আঃ) বলেন, এটি সংকটপূর্ণ অবস্থা। যদি তুমি উদাসীনতা প্রদর্শন কর তবে তোমার এই উদাসীনতা তোমাকে অগ্নির ইন্ধন বানাতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক ঐ কথা যা সংকটপূর্ণ তা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। নাযুক শব্দের অর্থ critical (সংকটপূর্ণ), ইংরেজীতে বলা হয় critical (সংকটপূর্ণ) অর্থাৎ পা পিছলে গেলেই জাহান্নামে পতিত হওয়া অসম্ভব নয়। এইজন্য এই উপদেশকে ভাল করে হৃদয়ে গেঁথে নাও। **যখন তোমার আত্মা উগ্রতা প্রদর্শন করে তখন চিন্তা কর এই উষ্ণতার উৎস কোথায়? এটিকে ছেড়ে দিয়ে বিবেক-বুদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। মানুষ মনে করে এই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মানুষ সত্যিকার অর্থে বিবেক-বুদ্ধি লাভ করতে পারে। সারা পৃথিবী খোদাতাআলা থেকে দূরে যাওয়ার কারণে বিবেক-বুদ্ধিহীন হয়ে আছে।** দৃশ্যতঃ সারা পৃথিবীতে বড় বড় বিবেক-বুদ্ধিমান মানুষ ও জাতি রয়েছে কিন্তু সিদ্ধান্তের সময়ে বাহ্যতঃ সিদ্ধান্ত নিজেদের অনুকুলে করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তারা খোদাতাআলার ক্রোধের মূল্যে জাহান্নামের রাস্তা অবলম্বন করে থাকেন। এজন্য **পশ্চিমা দেশের বাহ্যিক অগ্রগতি দেখে মোটেও প্রভাবান্বিত হবেন না। তাদের ভাল জিনিষগুলি অবশ্যই শিখুন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সমস্ত পৃথিবীর নেতৃত্ব আজ এমন ব্যক্তিদের হাতে রয়েছে যারা নিজ হৃদয়ের অবস্থা পরখ করে দেখার সুযোগই পায় না। তাদের**

প্রত্যেক **গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত খোদাতাআলা থেকে সম্পর্ক-শূন্য হয়ে থাকে। তাদের কল্পনায়ই আসে না যে, তাদের এই সিদ্ধান্ত তাদেরকে খোদাতাআলার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ থেকে দূরে নিয়ে যাবে।** এটি হচ্ছে বিষয়-বস্তু যাকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন, "স্মরণ রাখবে বিবেক-বুদ্ধি আত্মার পরিচ্ছন্নতা থেকে জন্ম নেয়।" কতজন রয়েছেন যারা এই বিষয়কে জানেন? তারা মনে করেন বিবেক-বুদ্ধি মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতা, উজ্জ্বলতা, দীর্ঘ জ্ঞান এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে জন্ম নেয়। এগুলি সবই মিথ্যা। অনেক বড় বড় বিদ্বান-বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত যখনই সিদ্ধান্ত নেন তখন খোদাতাআলার সন্তুষ্টিকে প্রয়োজনহীন মনে করে তা থেকে দূরে সরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। সুতরাং তাদের বিবেক-বুদ্ধি আত্মার পবিত্রতার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। এজন্য তারা বিবেক-বুদ্ধিহীন।

তিনি (আঃ) বলেন, স্মরণ রাখবে বিবেক-বুদ্ধি আত্মার পরিচ্ছন্নতা থেকে জন্ম নেয়। মানুষ আত্মাকে যে পরিমাণ পরিচ্ছন্ন করে সেই পরিমাণ তার বিবেক-বুদ্ধিতেও তীক্ষ্ণতা সৃষ্টি হয়। ফিরিশ্‌তা সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করে এটিও মহান একটি বিষয়। আত্মার পরিচ্ছন্নতার কারণে মানুষ যে বিবেক-বুদ্ধি লাভ করে সেই বিবেক-বুদ্ধির দাবী হল মানুষ যেন খোদাতাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যেকে সেই বিষয়কে অগ্রাহ্য করে যা বাহ্যতঃ তার পক্ষে হওয়া উচিত ছিল। এ ছাড়া আল্লাহতাআলার উদ্দেশ্য সেই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করবে যা বাহ্যতঃ দুনিয়ার দৃষ্টিতে তার জন্য তাৎক্ষণিক কল্যাণের বিরুদ্ধে যায়। যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য এমনটি করো তবে এটি কেবল বিবেক বুদ্ধি-ই নয় বরং বিবেক-বুদ্ধি এর চূড়ান্ত ফলের আকারে বুদ্ধিমত্তা হবে। বিবেক-বুদ্ধির ফল হিসেবে এটি প্রকাশ পাওয়া উচিত যে, আল্লাহতাআলা আপনাকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করবেন। আপনার উন্নতির জন্য অদৃশ্য থেকে ব্যবস্থা নিবেন। যে ব্যক্তি এ ধরনের বিবেক-বুদ্ধি লাভে অক্ষম হয় তার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত কেবল উপকারই উপকার বহন করে। কোন সিদ্ধান্তেই কোন ক্ষতি নেই। এই সেই ব্যক্তি যাকে এটিও স্মরণ করানো হয় যে, কিয়ামতের দিনে তোমার প্রতিটি কুরবানীর মূল্যায়ন হবে। এই অস্থায়ী দুনিয়ায় কেটে যাওয়াতে তোমার কোন পুণ্য কর্মকে অবমূল্যায়ন করা হবে না। এ ছাড়া আল্লাহ্‌তাআলার আরো একটি ব্যবহার আছে যা ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য প্রকাশ পায় যারা খোদাতাআলার অসাধারণভাবে সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা জেনে জীবনের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "ফিরিশ্‌তা সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সাহয্য করে।" "ফিরিশতা সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করে"– এটিও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানেন। কোন একটি ব্যাপারে যখন কোন ভরসা থাকে না তখন হঠাৎ একজন মানুষ সামনে আসে। মানুষের আকারেই বসে থাকে, সে সামানে দাঁড়িয়ে সাহায্য করে থাকে,. কিন্তু আপনি জানেন না সে কেন সাহায্যে করছে এবং কী কারণ ঘটে গিয়েছে। এই ঘটনাগুলি আহমদীদের অভিজ্ঞতায় অগণিত, এটি কোন কাল্পনিক কথা নয়। যদি আপনি মনে করেন যে, সত্যিকার অর্থে ফিরিশ্‌তা নিজের রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হবে তাহলে আপনার এই ধারণা একটি স্বপ্ন হয়ে থাকবে। আপনি এখন বলবেন, আমাদের কোথায় এমন শক্তি আছে। আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলার কি এমন নৈকট্য ও মাহাত্ম্য আছে যে, খোদাতাআলার পক্ষ থেকে কোন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের সাহায্য করবে? আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সহস্র আহমদী এমন আছেন যারা নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেছেন। (তারা লিখেন) এমন অবস্থায় যখন একটি ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে হচ্ছিল তখন এক ব্যক্তি সামনে এসে সাহায্য করে। আমি জানি না কেন সাহায্য করছে। এমন মানুষেরা অদৃশ্য থেকে এসে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের নাম ফিরিশ্‌তা রেখেছেন। তারা সাহায্যের জন্য নির্দেশ পায়। সে ব্যক্তি জানে না যে, তাঁকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে কিন্তু সাহায্যের জন্য তাঁকে ব্যবহার করা হয়। **প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে অসম্ভব অবস্থায় কাউকে সাহায্য করতে দেখে তার বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ফিরিশ্‌তার সাহায্য এভাবেই হয়ে থাকে।** "বিশৃঙ্খল জীবন যাপনকারীর হৃদয় এথেকে আলোকিত হতে পারে না।" যে ব্যক্তি অপবিত্র এবং খোদাতাআলা থেকে দূরত্বের জীবন যাপন করে তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে আপনি জ্যোতির্মণ্ডিত দেখবেন না। "তাকওয়া অবলম্বন কর যেন খোদাতাআলা তোমাদের সাথে থাকেন।" গুটিকতক শব্দ কত ব্যাপক (তার অর্থ)। কীভাবে হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। তাকওয়া অবলম্বন কর যেন খোদাতাআলা তোমাদের সাথে থাকেন। সত্যবাদীদের সাথে থাক তাতে যেন তাকওয়ার সত্যিকার মর্ম তোমাদের নিকট উন্মোচিত হয়। দ্বিতীয় অংশটি অত্যন্ত, কার্যকরী এবং প্রাত্যহিক জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী। সৎ সংগ অবলম্বনের দর্শন তিনি (আঃ) বর্ণনা করছেন, "তাকওয়া অবলম্বন কর যেন খোদাতাআলা তোমাদের সাথে থাকেন।" খোদাতাআলা যদি তোমাদের সাথে থাকেন তবে তোমাদের অভ্যাসসমূহেও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে আর এ জন্য তোমাদেরকে সত্যবাদীদের সাথে থাকতে হবে। "খোদাতাআলা তোমাদের সাথে থাকেন"-এর পরিচয় বর্ণনা করে দিয়েছেন। কোন মানুষ এ দাবী করতে পারে যে, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। সাধারণ মানুষের অসুবিধার সময় কখনও সাহায্য করা হয়ে থাকে, খোদাতাআলা সাহায্য করে থাকেন অবিশ্বাসীদের ও সাহায্য করা হয়ে থাকে। এতে কেউ যেন এই ধোঁকায় না পড়ে যে, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। আল্লাহ্ যদি সাথে থাকেন তবে জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে এবং প্রত্যেক মোড়ে আল্লাহ্ সাথে থেকে থাকেন। দেখুন! তার জাগতিক পরিচয় কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "সত্যবাদীদের সাথে থাক।" খোদাতাআলা তোমাদের সাথে আছেন বলে যদি তোমাদের ধারণা বা বিশ্বাস থাকে তবে তোমাদেরও উচিত যে, তোমরা খোদাতাআলার সাথে থাক। যারা আল্লাহ্‌তাআলার সাথে থাকে তাদের মধ্যে সত্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। স্বভাবতই তুমি এমন লোকদের সাথে থাকবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি উপদেশ দিয়ে সেই উপদেশের জবাব আর সেই উপদেশকে চেনার লক্ষণাবলী সাথে সাথেই বর্ণনা করে দিচ্ছেন। একটি উদ্ধৃতিই সারাজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আপনি যদি দ্রুত পড়ে যান তবে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কী বর্ণনা করে গেছেন। যদি বিশ্বাস থাকে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কোন কথাই কুরআন, হাদীস এবং তাঁর নিজের রূহানী অভিজ্ঞতা থেকে বাইরে নয় এবং প্রত্যেক বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের সংগে একটি সম্পর্ক রাখে তাহলে আপনার উপকার হবে। এর বিপরীত বিশ্বাস থাকলে কোন উপকার হবে না। সুতরাং এটিকে দেখুন যে, "তাকওয়া অবলম্বন কর যেন খোদাতাআলা তোমাদের সাথে থাকেন"। তাকওয়ার কত উন্নত ফলই আমাদের হয়েছে যে, "সত্যবাদীদের সাথে থাক।" তোমরা যদি চাও যে, খোদাতাআলা তোমাদের সাথে থাকুন তাহলে তাদের সংগে থাক

যারা খোদাতাআলার সংগে আছেন এবং খোদাতাআলা তাদের সংগে আছেন। "এতে করে তাকওয়ার সত্যিকার মর্ম তোমাদের নিকটে উন্মোচিত হবে।' খোদাতাআলার নিষ্ঠাবান লোকদের ব্যবহারকে যখন নিকট থেকে দেখবে তখন সেই সময় তোমাদের উপর তাকওয়ার সত্যিকার মর্ম উন্মোচিত হবে।" (এ ব্যাপারে) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সব সময় জামাতকে নসিহত করে আসছেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি যারা দূর থেকে বয়াতের চিঠি পাঠিয়ে দৃশ্যতঃ মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতেন, তিনি (আঃ) তাদের বলতেন, তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক যে, তোমরা এখানে এসে আমার নিকট কিছু সময় অবস্থান কর। এ কথার উপর এত গুরুত্ব দিতেন যে, ঐ যুগের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে, এত বড় বোঝা তিনি (আঃ) কীভাবে সহ্য করতেন। দূর-দূরান্ত বা নিকট থেকে যে-ই বয়াতের জন্য লিখত আর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অনুভব করতেন তার তরবীয়তের প্রয়োজন আছে। তিনি (আঃ) কেবল নসিহতকেই যথেষ্ট মনে করেন নি বরং বলেছেন আস আমার নিকট অবস্থান কর। নিকটে থাকার কারণে তাঁর (আঃ) পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, "তোমরা আমার নিকট থাকবে আর আমার সাথে খোদাতাআলার থাকা তোমরা দেখতে পাবে না এটি কোনভাবেই হতে পারে না। তোমরা অবশ্যই আমার সাথে খোদাতাআলার থাকা দেখতে পাবে।" বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে তিনি (আঃ) পরিষ্কারভাবে এটি তুলে ধরেছেন। এটি সেই কেন্দ্রীয় উপদেশ যা সৎসংগের সাথে সম্পর্ক রাখে। যখন নবীদের সাহচর্য লাভ হয় তখন এই সত্যকে আপনি অত্যন্ত মহিমার সাথে বিকশিত হতে দেখবেন। যদি আপনি সত্যিকার অর্থে খোদাতাআলার নৈকট্য লাভের জন্য খোদাতাআলার কোন পুণ্যবান ব্যক্তির সাহচর্য গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ্‌কে আপনি সেখানে দেখতে পাবেন। সকাল, সন্ধ্যা প্রত্যেক কাজে আপনি খোদাতাআলাকে তাদের সাথে দেখতে পাবেন। অনেক সাহাবী নিজেদের অভিজ্ঞতাকে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, "প্রথমে আমরা কীভাবে দূর থেকে ঈমান আনয়নকারী ছিলাম। যখন নিকটে এসেছি আর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে অবস্থান করেছি তাঁর সাহচর্য আমাদের জীবনের মোড় কীভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে?" তারা বর্ণনা করছেন, "কোন মুহূর্তই এমন কাটেনি যখন আমরা খোদাতাআলার অনুকম্পার বৃষ্টি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপরে বর্ষিত হতে দেখিনি।" তিনি (আঃ) বলেন, "সত্যবাদীর সাথে থাক যেন তাকওয়ার সত্যিকার মর্ম তোমাদের নিকটে উন্মোচিত হয় আর তোমরা যেন তৌফীক পাও"। সত্যবাদীদের সাথে অবস্থানে তাকওয়ার তৌফীকও পাওয়া যায়। যারা ভাল মানুষের সাথে জীবন কাটায় তাদের পুণ্যের তৌফীক বেড়ে যায়। যারা নবীদের সাহচয পায় তাদের পুণ্যের তৌফীক এমন দ্রুত বেড়ে যায় যে, যারাই সাহাবীদের দেখেছেন তারা তাদের মধ্যে ঐ (নবীদের) ছাপ দেখে থাকবেন। সাহাবী এবং অ-সাহাবীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আধ্যাত্মিক সাহচর্যে যারা সাহাবীদের রং অবলম্বন করেছেন তাদের এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এটি আমাদের মূল উদ্দেশ্য "এটি আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই"। সুতরাং এই পবিত্র পরিবর্তনের সাথে পবিত্র ব্যক্তিদের নিয়ে জামাত তৈরী করুন। পুণ্যবান ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে বসুন। **পুণ্যবান ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে একে অন্যের ভিতর খোদাতাআলার নিদর্শন অনুসন্ধান করুন**। কিন্তু (বাহ্যতঃ) দোয়াকারী সেই দলের ন্যায় হবেন না যারা এক সময় রাবওয়াতে ছিল এ ছাড়া অন্য কয়েক জায়গায়ও পাওয়া যায়। (তারা) কতক মানুষ (যারা) দৃশ্যতঃ সুফীদের (মুত্তাকীর) ন্যায় বস্ত্র পরিধান করে, কতক মানুষকে বুযূর্গ আখ্যা দেয়। যাদেরকে তারা বুযুর্গ আখ্যা দেয় তাদের একটি দল হয়ে থাকে। তারা একত্রে চলাফেরা করে, ভ্রমণের জন্য একত্রে বের হয়, সন্ধ্যায় সম্মিলিত হয়, ঘরে একত্রিত হয় এবং সম্মিলিতভাবে দোয়াও করে। (তারা বলে) দেখ, এটি পুণ্য কর্ম। (বাস্তবে) এটি পুণ্য নয়। এটি পুণ্যের যথার্থ মর্ম থেকে অজ্ঞতা। পুণ্য শিখতে হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদ্ধতি থেকে শিখুন। এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজের সত্তায় তাঁর (সাঃ) সুন্নতকে প্রদর্শন করেছেন, সেটিকে নিকট থেকে দেখুন। **যদি আঁ হযরত (সাঃ)-এর যুগ দূরে মনে হয় তবে নিকট যুগের মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে দেখলে সেটি অত্যন্ত নিকটে এসে যাবে। এভাবে প্রাথমিকদের সংগে পরবর্তীদেরকে মিলানো হবে**। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কয়েক জনকে নিয়ে কোন দল গঠন করতেন না, এটি তাঁর (আঃ) পদ্ধতি ছিল না। তিনি (আঃ) মন্দদেরকে তাঁর সাহচর্য গ্রহণ এবং তাঁর সাহচর্যের রং অবলম্বনের জন্য ডাকতেন। অনেক দুর্বল তাঁর এই ডাকে স্বতস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছেন। নিকটে পৌছে তারা আর দুর্বল থাকেন নি। তাদের ভিতরে আশ্চর্যজনক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। আজও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই সাহচয কতক পুণ্যবান ব্যক্তির আকারে নিয়োজিত করে রেখেছেন। তাদের কোন লোক দেখানো ভাব নিজেদের প্রাধান্যের কোন অনুভূতিও নেই, তারা সরল সাধারণ মানুষ। এই কথার দিকে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই যে, মানুষ তাদের পুণ্যবান মনে করে কি না। তারা সর্বাবস্থায় ধর্মের সেবা করে যাচ্ছেন। তাদের মাঝে পুণ্য কাজ করার ক্ষিপ্রতা সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যক্তিগণই আজ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার ফল। সুতরাং **এই সমস্ত ব্যক্তিদের সংগে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ় কর। দল গঠন করে পৃথক হওয়ার জন্য সম্পর্ক দৃঢ় করবে না। সম্পর্কের উন্নয়ন এমনভাবে কর যেন দুর্বলরাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। তারাও যেন আপনার সাহাচর্যের রংগে...হয়ে যায়**। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এটিই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এটিকেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।"

অন্য একটি লেখা যার শিরোনাম হচ্ছে, আহমদীয়া জামাতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমাদের জামাতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তারা যেন নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে। কেননা, তারা তাজা তত্ত্বজ্ঞান পেয়ে থাকে।" এটি সেই মূল বিষয় যা আপনাদের বুঝা উচিত। আপনারা সব সময় তাজা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে থাকেন। পৃথিবীতে কি এমন কোন জামাত রয়েছে যারা সব সময় তাজা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে?

আপনাদের সম্মুখে আমাদের পত্র-পত্রিকা এম.টি.এ বক্তৃতা ও ওয়াজ নসিহতকারী ব্যক্তি এবং অন্যান্য পদ্ধতি সবই আপনাদেরকে তাজা তত্ত্বজ্ঞান দিচ্ছেন। যখন আপনি পবিত্র হৃদয়ে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট যাবেন, উপকৃত হওয়ার জন্য নিজের হৃদয়ের দরজা খুলবেন তখন স্মরণ রাখবেন আপনারাই সেই জামাত যারা সর্বদা তাজা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করছেন। তাজা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়টিতে আরও একটি হৃদয়গ্রাহী বিষয় রয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পবিত্র ব্যক্তিদের অর্থাৎ এই জামাতকে সব সময় নতুন নতুন বিষয় বুঝিয়ে থাকেন। তাজা তত্ত্বজ্ঞানের দু'টি দিক রয়েছে একটি হ'ল ঔ তত্ত্বজ্ঞান যা দর্শন এবং শ্রবণকারীদের জন্য সতেজ হয়ে থাকে। অনেক সময় মানুষ লিখে এই বিষয়গুলোকে শুনেছিলাম কিন্তু পূর্ণরূপে বুঝতে পারিনি। অথচ কুরআন করীমে সবসময় এভাবেই তা বিদ্যমান ছিল।

এখন এমন মনে হয় যেন তাজা তত্ত্বজ্ঞান, কোন জিনিসকে নতুন করে জানার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এছাড়া অনেক সময় তাজা নিদর্শনের আকারে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই দ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনাও তাজা তত্ত্বজ্ঞানের শব্দে বর্ণনা করেছেন। **যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহলে তার উপর তাজা তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। যদি সে (নিজের উপর) তাজা তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ হতে অনুভব না করে তবে অবশ্যই তার উচিত সে যেন খোদাতাআলার এমন ব্যক্তিদের নিকট যায় যাদের নিকট সে খোদাতাআলার তাজা তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ হতে দেখবে। তারপর আরও জেনে নিবে যে, এ তত্ত্বজ্ঞান খোদাতাআলার দান ছাড়া কারো হৃদয়ে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।** সুতরাং তিনি (আঃ) বলেছেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তারা যেন নিজেদের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে। কেননা, তাদের তাজা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের দাবী করে কেউ যদি সে রাস্তায় না চলে তাহলে এটি কেবল দাবীসর্বস্ব তাজা তত্ত্বজ্ঞানের সাথে সেই কর্মের কথাও বর্ণনা করেছেন যা তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়ের জন্য আবশ্যক। এক ব্যক্তি বলতে পারে, আমার উপর তাজা তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ হচ্ছে। অবশেষে কতক এমন ব্যক্তি পাগলও হয়ে যায়। যাদের উপর তাজা তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ হয় তাদের মধ্যে তাজা পরিবর্তনও হয়ে থাকে। তাজা তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ হওয়ার কারণে তাদের পাপ ঝরে যায় নতুন উন্নত চরিত্রের সৃষ্টি হয়। পূর্বে তারা উদাসীনতার কারণে কতক পাপকে চিনতে পারত না কিন্তু যখন তাজা তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ হয় তখন তাদের চোখ সেই পাপকে চিনতে আরম্ভ করে। এই সফরটি এমন যা চলমান। আমি এর থেকে বাইরে নই। আপনাদের মধ্য থেকে কেউ এর বাইরে নয়। নবীরাও যখন সবসময় তাজা তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ হতে দেখেন তখন নিজেদের হৃদয়ে পুণ্যের একটি নতুন রং প্রবাহিত হতে দেখেন। সুতরাং এটি চিরস্থায়ী সফর। নগণ্য ব্যক্তিদের জন্যে তাজা তত্ত্বজ্ঞান তাদের মন্দের উপর আলোকপাত করার কারণে হয়।

মানুষ সেই পাপগুলিকে চিনতে আরম্ভ করে যা পূর্বেই তার হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল। অথচ খেয়ালই হয় না যে, আমাদের হৃদয়ে অভ্যাস এবং আলোচনায় ঐ পাপ বিদ্যমান আছে। বিদ্যমান থাকত (কিন্তু সনাক্ত করতে পারত না)। নবীদের তাজা তত্ত্বজ্ঞান তাদের গুণাবলীকে উন্নত করার কারণ হয়। তাজা তত্ত্বজ্ঞান সবসময় ফলপ্রদ হয়ে থাকে। মানুষের উপর সব সময় এমন নিদর্শন ছড়াবে যাতে সে কিছু না কিছু পরিবর্তিত সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি যারা দাবী করে আর আমার কাছে অনেক সময় লিখে থাকে যে "আমরা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী এবং আমাদের উপর তাজা তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ হচ্ছে।" শব্দ ওরূপ ব্যবহার না করলেও বিষয়-বস্তু ওরূপই হয়ে থাকে। তাদেরকে অনেক সময় আমি এটি লিখি এবং বুঝাই যে, ভাই! এই তাজা তত্ত্বজ্ঞান কি তোমার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করেছে? (তোমরা) পূর্বের তুলনায় কি তোমরা ভাল হয়ে গিয়েছে? এদিকে যদি কোন দৃষ্টি না থাকে-আর মনে কর যে, তোমাদেরকে পুরস্কারের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে, তাহলে এটি সীমাতিরিক্ত অজ্ঞতা হবে। এটি তত্ত্বজ্ঞান নয় বরং এটি হচ্ছে খোদাতাআলা থেকে দূরে সরে যাওয়ার নামান্তর। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাজা তত্ত্বজ্ঞানের যে পরিচয় বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, "তত্ত্বজ্ঞানের দাবী করে কেউ যদি সে রাস্তায় না চলে তাহলে এটি কেবল দাবীসর্বস্বই। সুতরাং আমাদের জামাতকে অন্যদের অলসতা যেন উদাসীন না করে।" এটিও একটি বিস্ময়কর লেখা। এটির (তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে) কী সম্পর্ক রয়েছে? **"আমাদের জামাতকে যেন অন্যদের দুর্বলতা উদাসীন না করে দেয় এবং অলসতায় যেন তাকে শক্তি না যোগায়।"** আপনি যাদেরকে পুণ্যবান ভেবে নিকটে যান তারপর তাদের ভিতরে যদি অলসতা পান তাহলে এই অলসতা যেন আপনাকে উদাসীন না করে দেয়। আপনি মনে করছেন তারা 'ওলীউল্লাহ্', 'বুযুর্গ' অথচ তাদের নৈকট্য আপনার মধ্যে কোন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে না। এটি হচ্ছে (মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতির) অর্থ যে, এমতাবস্থায় তাদের দুর্বলতা আপনাকে উদাসীন করে দিবে। এটিই প্রকৃত চিত্র। আমরা এমন অনেক বুযুর্গের মূর্তি দেখেছি যাদেরকে নিজের আত্মার কামনা পূর্ণ করা ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক ব্যক্তি পসন্দ এবং সম্মান করে থাকে। তা সত্ত্বেও এরূপ উদাহরণ দেয় যে, তাদের দোয়ায় আমাদের এই কাজ হয়ে গেছে, ঐ কাজ হয়ে গেছে। এমন কাজ হয়ে যাওয়া যা আল্লাহ্‌তাআলা থেকে আপনাকে উদাসীন করে আর আপনার অবস্থার মাঝে পবিত্র পরিবর্তনের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এটি হচ্ছে সেই অলসতা এবং দুর্বলতা। বাহ্যতঃ আপনি একজন পবিত্র ব্যক্তিকে দেখেছেন কিন্তু তিনি আপনার ভিতরে কোন পবিত্র পরিবর্তন করেন না। এক্ষেত্রে এটিই যথেষ্ট যে, আপনি তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করুন আর এটি প্রচার করেন যে, তার দোয়াতে এসব হয়েছে।

আমার সম্পর্কে যখন আপনারা প্রচার করেন যে, তার দোয়ায় (এটি হয়ে গেছে)। এমন ক্ষেত্রে আমি বড় ভয় পাই। আমি সর্বদা এটি বুঝানোর চেষ্টা করি যে, আমার দোয়ার ফলে যদি কিছু হয় আর আপনি আলাহ্‌তাআলার নিকটে না আসেন যা আপনাকে দান করেছেন তাহলে এটি আপনার অজ্ঞতা। আপনার এই প্রশংসা আমার জন্য তিরস্কারস্বরূপ। এটি আমার জন্য ভয়ের কারণ আনন্দের কারণ নয়। **হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই লেখাগুলিকে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখুন, "এবং অলসতা যেন শক্তি না যোগায়"। যখন মানুষ এমন ব্যক্তিদের উপর নিজেদের বোঝা চাপায় যে, তারা দোয়া করলে আমরা ঠিক হয়ে যাবে। তাদের অবশ্যই অলসতায় শক্তি যোগানো হয়ে থাকে।** তারা বলেন, আমাদের জন্য দোয়া করার মানুষ আছে আমাদের পুণ্য কর্ম করার প্রয়োজন কি? স্পষ্ট ভাষায় বলুক বা না বলুক। তাদের জীবন আপনাদের নিকট এটিই প্রমাণ করবে। আর বলবে অমুকের দোয়ায় এটি হয়ে গেছে, ঐটি হয়ে গেছে। অমুক ইন্টারভিউতে আমরা সফলকাম হয়েছি। নিজের সত্তায় চিন্তা করুন। আল্লাহ্‌র ইন্টারভিউতে তারা সফলকাম হয়েছে কি? আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি তাদের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে কি? যদি (পবিত্র পরিবর্তন) না করে থাকে তবে এগুলো কেবল দাবীসর্বস্ব। আল্লাহ্‌তাআলা আহমদীয়া জামাতকে দাবীসর্বস্ব জীবন থেকে মুক্তিদান করুন। যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) পুণ্যের গভীরে গিয়ে পুণ্যের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন সেই সংজ্ঞাকে বুঝে নিজের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের তৌফীক দান করুন। (আমীন)

(অডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত ও অনূদিত)

অনুবাদ–মওলানা বশীরুর রহমান

সদর মুরব্বী

ইনকিলাবে হাকীকী
(প্রকৃত বিপ্লব)

মূল : হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(১৬তম কিস্তি)

দ্বিতীয় বিপ্লব–ঐশী গুণাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা

দ্বিতীয় বিপ্লব হযরত মূসা আলাহেস সালামের মাধ্যমে সাধিত হয়েছিল। উহা এই ছিলো যেন ঐশী গুণাবলী বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর যুগে যেহেতু মানবীয় বোধ উন্নতি করেছিলো এবং কতক ঐশীগুণের সূক্ষ্ম বিষয়াবলী প্রকাশিত হয়েছিলো কিন্তু ঐশী গুণাবলীর সূক্ষ্ম পারস্পরিক সম্পর্কাবলী ও ঐশী গুণাবলীর ব্যাপক সীমা-পরিসীমা ঐ সময় পর্যন্ত দুনিয়া উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে নি। আর উহার সামনে তা উপস্থাপন করাও হয়নি। হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে বিশ্ব ইহার যোগ্যতা অর্জন করলো। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপরে ঐশীগুণাবলী ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হলো যার কারণে লোকদের মধ্যে বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে উপলব্ধি করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিলো। যেন গুণাবলীর সার্বিক জ্ঞান বিস্তারিত আকারে পরিবর্তিত করে বান্দা ও খোদার মধ্যে এবং বান্দা ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী একটি উন্নততর আকৃতি বের হয়ে আসলো। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর যুগে কেবল আল্লাহতাআলার একত্ব পর্যন্ত মানব মস্তিষ্ক উন্নতি করেছিলো। ঐ পর্যন্ত উন্নতি করেনি যে, সে উপলব্ধি করতে পারে যে, ঐশীগুণাবলী বর্তমান সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মত পৃথক পৃথক আছে। উহার দৃষ্টান্ত এমনই যে, যেভাবে আমরা পূর্বে বলেছি যে, একজন বাদশাহ্ রয়েছেন যার আনুগত্য করা আবশ্যক। আবার অন্য সময়ে আমরা বলি যে, ঐ বাদশাহ্‌র অধীনে কতক কর্মকর্তা আছেন তাদের সকলের আনুগত্য করা আবশ্যক। আর তাদের আনুগত্যও বাদশাহ্‌র আনুগত্যের শামেল। পুনরায় আমরা ইহা বলি যে, ইনি অমুক বিভাগের কর্মকর্তা এবং তিনি অমুক বিভাগের কর্মকর্তা, এ বিভাগ শিক্ষার সাথে সম্পর্ক রাখে। এটি তরবীয়তের সাথে সম্পর্ক রাখে। এভাবে খোদাতাআলারও বিভিন্ন গুণ রয়েছে। আর ঐসব গুণাবলীরও বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। যেগুলোকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার পরে মানুষের মধ্যে সত্যিকারের দোয়ার আবেগ সৃষ্টি হয়।

অতএব হযরত মূসা আলায়েহস সালামের যুগে লোকদের নিকট এ দরজা খুলে দেয়া হলো এবং ঐশী গুণাবলীর ব্যাপারে তাকে ব্যাপক জ্ঞান দান করা হলো। সুতরাং যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর কিতাবকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন তারা উপলব্ধি করতে পারেন যে, মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে যে পর্যন্ত ঐশীগুণাবলী বর্ণিত হয়েছে কাছাকাছি এতটা গুণাবলীই কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। আমি একবার চিন্তা করলাম তখন আমার কমপক্ষে ঐ সময়ে এমন কোন নূতন গুণ দৃষ্টিতে পড়ে নি– যা কুরআন বর্ণনা করেছে কিন্তু তওরাত বর্ণনা করে নি। ঐ রব্ব, রহমান, রহীম ও মালেকে ইয়াওমিদ্দীন প্রভৃতি গুণাবলী যা ইসলাম বর্ণনা করেছে উহাই হযরত মূসা (আঃ) বর্ণনা করেছিলেন। মোটকথা মুসায়ী যুগে মানুষের মস্তিষ্ক এতটা যোগ্যতা অর্জন করেছিলো যে, ঐসব ঐশীগুণাবলীর সে উচ্চ স্তরের বিভাগ রয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারে। যেন ঐশীগুণাবলীর সার্বিক জ্ঞান বিস্তারিত আকারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর বান্দা ও খোদার এবং বান্দা ও বান্দার মধ্যে সম্পর্কের উন্নততর আকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। এর ইহাই কারণ যে, মূসা (আঃ) ঐ প্রথম নবী যার পরে নবীদের এক দীর্ঘ ধারা এমন এসেছে যারা সার্বিকভাবে তাঁর শরীয়তের অনুবর্তী ছিলো; যদিও তাঁদের সরাসরিভাবে নবুওয়ত লাভ হয়েছিলো। তাই যখন মানুষ খোদাতাআলার গুণাবলীর বিভাগগুলো সম্বন্ধে বুঝতে চেষ্টা করলো তখন খোদাতাআলা বল্লেন, এখন তোমরাও তোমাদের বিভাগ তৈরী করে নাও যেন এখন থেকে তোমাদের মাধ্যমে একটি বাহ্যিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং খলীফাগণ আসবেন, তারা শাসন করবেন। অতএব হযরত মূসা (আঃ) প্রথম নবী ছিলেন যাঁর পরে প্রত্যাদিষ্ট খলীফাগণ এসেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে নবীদের এক দীর্ঘ ধারা অব্যাহত থাকে। যারা সরাসরিভাবে নবুওয়ত লাভ করতেন কিন্তু তাঁরা মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের অধীন ছিলেন।

ঐ সময় ধর্ম-রীতিমত একটি দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করে। ইহা মানবীয় জীবনের সব দিকে আলোকপাত করেছিলো; যেন শরীয়তের অট্টালিকায় পরিণত হয়ে চারিদিক থেকে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। ইহাই দর্শনের চূড়ান্ত মার্গ ছিলো যে, ইবরাহীম (আঃ) যখন ঐশীগুণাবলীর দোর গোড়ায় আসলেন তখন বললেন– রব্বি আরিনী কায়ফা তুহ্‌ইল মাওতা (সূরা বাকারাঃ ২৬১ আয়াত) অর্থাৎ হে আমার প্রভু! মৃতকে জীবিত করার গুণের প্রকাশ আমাকে দেখাও। কিন্তু যেহেতু মূসা (আঃ) ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর চেয়ে ঐশীগুণাবলী সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান রাখতেন তাই তিনি বল্লেন, রব্বী আরিনী আনযুর ইলায়কা (সূরা আরাফঃ ১৪৪ আয়াত)। অর্থাৎ হে আমার প্রভু! তোমার সব রকমের গুণাবলীর জ্ঞান আমার লাভ হয়েছে, এখন আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, তুমি তোমার গোটা সত্তা আমাকে দেখিয়ে দাও। যেন একজন কেবল একটি গুণের বিকাশ দেখতে চেয়েছেন কিন্তু অন্যজন স্বয়ং খোদাকেই দর্শন করতে চেয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেন: রব্বী আরিনী কায়ফা তুহ্‌ইল মাওতা আর হযরত মূসা (আঃ) বলেন: রব্বী আরিনী আনযুর ইলায়কা। একজন বলেন– আমাকে জীবিত করার গুণের দৃষ্টান্ত দেখাও। অপরজন বললেন,– আমাকে তোমার সবকিছু দেখাও।

দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম এই যে, যখন কোন নবী আবির্ভূত হন তখন লোকেরা তো তাকে ছোট মনে করে কিন্তু তাঁর পূর্বের নবীকে বড় মনে করে থাকে। এবং যখন পরে আগমনকারী নবীর পরিচয় বর্ণনা করা হয় তখন বলে, আগেরজন কি মূর্খ ছিলো? তাঁর এসব কথা কি জানা ছিলো না? এর এই কারণই যে, যখন মূসা (আঃ) বল্লেন যে, আমি খোদাতাআলাকে দর্শন করেছি তখন ইহুদীরা, যারা কিনা হযরত ইব্‌রাহীমেরই সন্তান ছিলো, তারা রাগান্বিত হলো। এই মনে করে যে, তার তো এই উদ্দেশ্য যে, আমাদের দাদা কম জ্ঞানী ছিলেন আর তুমি তাথেকে অধিক তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। এজন্যে তারা

হযরত মূসা (আঃ)-কে বললো যে, তুমি মিথ্যে বলছো। যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদেরকেও খোদাকে (প্রত্যক্ষভাবে) দেখিয়ে দাও। সুতরাং কুরআন করীমে এসেছে যে, মূসা (আঃ)-এর জাতি বললো, 'ইয়্যা মূসা লান নু'মিনা লাকা হাত্তা নারাল্লাহা জাহ্‌রাতান'–অর্থাৎ হে মূসা! আমরা তোমার এ কথা মানবার জন্যে প্রস্তুত নই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বয়ং খোদাকে প্রত্যক্ষ না করি (সূরা বাকারাঃ ৫৬ আয়াত)। এখানে 'নু'মিনা'-এর অর্থ ঈমান আনয়ন করা নয়। তারা তো আগেই হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপরে প্রকাশ্যভাবে ঈমান রাখতো। 'লান নু'মিনা'-এর অর্থ এই যে তুমি যে আমাদের বলছো যে, আমি খোদা দেখেছি– এতে তুমি মিথ্যেবাদী আর আমরা তোমার এ কথা অবশ্যই মানার জন্যে প্রস্তুত নই। অথচ যদি আমাদেরও দেখিয়ে দাও তাহলে পরে বেশ আমরাও মেনে নেবো।

ইহাই ছিলো ঐ আধ্যাত্মিক বিপ্লব যা সব দিক থেকে পূর্ণ ছিলো এবং মূসা (আঃ)-এর এ বৈশিষ্ট্য ছিলো যার কারণে বলা হয়েছে যে, এই আধ্যাত্মিক বিপ্লবের শেষ আন্দোলনও মূসা (আঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে সাধিত হবে। যেমন বলা হয়েছে–

"তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ্য এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে"– (দ্বিতীয় বিবরণ– ১৮ঃ১৫-১৬) এবং শেষ ধর্মগ্রন্থে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে– 'ইন্না আরসালনা ইলায়কুম রাসূলান শাহিদান আলায়কুম কামা আরসালনা ইলা ফিরআওনা রসূলা" (সূরা মুজ্জাম্মিলঃ ১৬ আয়াত)। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে, পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত নিয়ে এসছেন ইহা যদিও প্রত্যেক দিক থেকে পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে কিন্তু বাহ্যিকভাবে পূর্ণতার দিক থেকে মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ– অন্যদের সাথে নয়, অন্যদের কিতাবের দৃষ্টান্ত এমন যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের ন্যায় আর মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের দৃষ্টান্ত এমন যেভাবে একটি অট্টালিকা যার মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনের খাতিরে বিভিন্ন কক্ষ রয়েছে। এর সর্ব প্রকার প্রয়োজনের ব্যবস্থা এতে পূর্ণভাবে মজুদ আছে। আর কুরআন করীমে যদিও তাজমহলের ন্যায় সব অট্টালিকার মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিন্তু সাদৃশ্যের দিক থেকে ঐ অট্টালিকার সাথে সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারে, আলাদা আলাদা করে নির্মিত কক্ষগুলোর সাথে নয়, অতএব মূসা (আঃ) ঐ প্রথম নবী ছিলেন যার মাধ্যমে ঐ পূর্ণ বিধান পাওয়া গেলো যা কিনা সকল ব্যবস্থাপনার ওপরে বিস্তৃত ছিলো। যদিও উন্নত বিন্যাসের দিক থেকে উহার মধ্যেও কমতি ও দুর্বলতা ছিলো। (চলবে)

অনূবাদ– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

হাকীকাতুল ওহী-এর অবশিষ্টাংশ

অভিসম্পাতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া যাইবে এবং গৃহীত হওয়া হইতে বঞ্চিত থাকিবে। এবং মানুষের দৃষ্টিতেও হেয় হইবে এবং সম্মান ও প্রতাপও চলিয়া যাইবে। মোট কথা, খোদার নিকট 'অভিসম্পাত' শব্দটি সকল ব্যর্থতা ও পরিত্যক্ত হওয়ার অর্থে প্রযোজ্য এবং সকল ধরনের বরকত হইতে বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়া ইহার গণ্ডীভুক্ত। যে ব্যক্তির উপর খোদার অভিসম্পাত পড়িবে তাহার ফল হইবে ধ্বংস ও বিনাশ। এই কারণেই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি নাজরানের খৃষ্টানরা আমার সহিত মুবাহালা করিত (যাহা লা'নাত উল্লাহে আলাল কাযেবীনের সহিত করা হইয়া থাকে) তবে তাহাদের উপর এত মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা আপতিত হইত যে, তাহাদের বৃক্ষের পাখীগুলিও মরিয়া যাইত।

এখন বাবু এলাহী বক্স সাহেবের ইলহামের অর্থ সকল ন্যায়-বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি বুঝিতে পারে, যাহাতে মুলায়েনাহ্ এর উল্লেখ আছে। কেননা, ইলহামের অর্থ এই যে, আমার ও বাবু সাহেবের মধ্যে যে অভিসম্পাতের কথা হইয়াছিল, যাহার উল্লেখ আছে "আসায়ে মূসা" পুস্তকের ২ ও ৭ পৃষ্ঠায় এবং উক্ত পুস্তকের অন্যান্য স্থানেও, ঐ অভিসম্পাতের কুপ্রভাব আমার উপরই নড়িবে এবং আমি তাহার জীবদ্দশায় ধ্বংস ও বিনাশ হইয়া যাইব; অথচ খোদাতাআলার ইচ্ছা ইহার বিপরীত ব্যাপার ঘটাইল। বাবু সাহেব কেবল আমার জীবদ্দশাতেই প্লেগে ধ্বংস হইল না, বরং সে তাহার সকল আশা-আকাংখায় ব্যর্থ থাকিয়া এই পৃথিবী হইতে বিদায় নিল। পক্ষান্তরে খোদা আমাকে সর্বতোভাবে সফল করিলেন। বস্তুতঃ হাজার হাজার শোকর করিতে হয় যে, এ পর্যন্ত প্রায় চার লক্ষ মানুষ আমার হাতে তাহাদের পাপ ও কুফরী হইতে তওবা করিয়াছে। খোদা আমাকে ঐ সম্মান দিলেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে অর্থাৎ ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকায় সম্মানের সহিত আমাকে খ্যাত করিয়া দিলেন। বস্তুতঃ ঐ ডক্টর ডুই, আমেরিকা ও ইউরোপের দৃষ্টিতে যাহার ঠাঁট বাট ছিল বাদশাদের ন্যায়, তাহাকে খোদা আমার মুবাহালায় ও দোয়ায় ধ্বংস করিলেন এবং বহু লোককে আমার দিকে ঝুঁকাইয়া দিলেন। এই ঘটনা পৃথিবীর সকল নামী-দামী পত্র পত্রিকায় প্রচারিত হইয়া সার্বজনীন খ্যাতির আকারে ছোট বড় সকলের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। আমি দেখিতেছি যে, যাহারা আমার হাতে বয়াত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হাজার হাজার ব্যক্তি মুত্তাকী হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের আমলের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পার্থিব দিক হইতে খোদা আমাকে ঐ সকল বরকত দান করিয়াছেন যে, খোদার বান্দারা আজ পর্যন্ত আমাকে কয়ে লক্ষ টাকা ও বিনয়ের সহিত বিভিন্ন প্রকারের উপঢৌকন দিয়াছে ও দিতেছে এবং খোদাতাআলার বিভিন্ন প্রকারের করুণার এক সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ- নাজির আহমদ ভূঁইয়া

টীকা ঃ ২৬ (ছাব্বিশ) বৎসর হইতে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে, (দূর-দূর হইতে তোমার নিকট অর্থ সাহায্য ও উপঢৌকন আসিবে। দূর-দূর হইতে তোমার নিকট জন সমাগম হইবে। এমনকি পথে গর্ত সৃষ্টি হইয়া যাইবে। ঐ সকল লোক তোমার সাহায্যকারী হইবে যাহাদেরকে আমি ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিব- অনুবাদক)। অতএব খোদার অদ্ভূত ফযল যে, একদিকেতো ঐ পুরাতন যুগের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল এবং অন্য দিকে লক্ষ লক্ষ টাকা আসিল ও কয়েক লক্ষ মানুষ আমার শীষ্য হইয়া গেল।

উটে চড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ

(৩য় কিস্তি)

(ঘ) বলিষ্ঠ সাংগঠনিক মানসিকতা

প্রাণিজগতে সাংগঠনিক মানসিকতায় মানুষ অনন্য সাধারণ। বলতে গেলে যেখানেই পরস্পর মিলেমিশে কাজ করতে হয় সেখানেই সংগঠন গড়ে তোলে। তাতে কাজ যেমন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে করা যায় তেমনি মানুষের মাঝে ঐক্যবোধ গভীর ও দৃঢ়তর হয়। তখন উদ্দেশ্য সাধন সহজতর হয়। এদেশের প্রবাদেও এর প্রতিফলন দেখা যায় যেমন: 'একটি তিল বার আউলিয়া ভাগ করে খায়'। আরো আছে 'চোরে চোরে মাসতুত ভাই'। যে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে তা হলো ভালমন্দ, কু-সু যে কোন উদ্দেশ্যেই সংগঠন গড়ে তোলা যায়, তোলা হয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে কিছু উদাহরণ নিলেই বিষয়টি স্পষ্টতর হবে। খেলাধূলা, হাটবাজার, লেখাপড়া, ধর্মকর্ম এসব আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। খেলাধূলাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নানা নামে টিম, ক্লাব ইত্যাদি গড়ে তুলতে হয়। এগুলো যেমন স্থানীয়ভাবে, তেমনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবেও (অলিম্পিক) গড়ে উঠছে। হাটবাজার পরিচালনার জন্য কমিটি থাকে। আন্তর্জাতিক ব্যবসাব-বাণিজ্যের জন্যও সংস্থাদি গড়ে ওঠে। শহর-বন্দর-নগর এসব পরিচালনার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন থাকে। গ্রাম জীবনেও নানা গ্রামীণ সংস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। লেখাপড়া তথা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার জন্য স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অনেক প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে উঠেছে। এসব পরিচালনার জন্যেও বিভিন্ন ধরনের কমিটি থাকে। রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য স্থানীয়, জাতীয় এমন কি আন্তর্জাতিক সংস্থাদি গড়ে উঠেছে। প্রথম মহাসমরের পর 'লীগ অব নেশন্‌স্' গড়ে উঠেছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠেছে 'জাতিসংঘ'। ধর্মকর্ম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধর্মে সংগঠনের অভাব নেই। এসবের মধ্যে কিছু গড়ে ওঠে ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য। কিছু গড়ে ওঠে অনুগামীদের খেয়াল-খুশীমত। তাই এসব সংস্থাদির পরিচয়ে বিশেষ কোন ধর্মের নাম থাকলেও সদস্যদের আচার-আচরণে ঐ ধর্মের শিক্ষা ও আদর্শের দূরতম সম্পর্কেরও সন্ধান পাওয়া যায় না।

ইসলামের আবির্ভাব বিশ্ব-ধর্মরূপে। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন: (বাংলা তর্জমা) 'তুমি বল, হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহ্‌র রসূল, যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী' (৭ঃ১৫৯ আয়াতাংশ)। এখানে বিশ্ব-ধর্ম ইসলামের পরিচালনার নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ বলেন: (বাংলা তর্জমা) তোমাদের মধ্য হতে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে নিযুক্ত করিয়া করিয়াছিলেন, এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন' (২৪ঃ৫৬ আয়াতংশ)। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় বা জাতি-গোষ্ঠিতে যত নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাদের সবার উপরে সমভাবে ঈমান আনার নির্দেশসহ তাদের মাঝে নবী হিসেবে পার্থক্য করতে বারণ করেছেন। সমগ্র মানব জাতিকে একই সম্প্রদায়ভুক্ত হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নবুওয়ত এবং এর মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমগ্র মানব জাতির জন্য একই ঐশী নেতৃত্বের বিধান দিয়েছেন। এসব সম্পর্কে কুরআন হতে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো: (বাংলা তর্জমা) 'মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত (২ঃ২১৪ আয়াতাংশ)। 'আমরা তাঁহার রসূলগণের কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য করি না' (২ঃ২৮৬ আয়াতাংশ)। 'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী' (৪ঃ৬০ আয়াতাংশ)। বিভিন্ন কারণে [বর্ণ, ধর্ম, মতাদর্শ, ভাষা, দেশ ইত্যাদি) বিভক্ত মানবতা যে ক্রমাগত একই অভিন্ন মানবতার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এর বহু প্রমাণের মাঝে একটি অতীব তাৎপর্যবহ প্রমাণ হলো বর্তমানে বিশ্ববাসী বছরে অর্ধ শতাধিক 'বিশ্ব দিবস' পালন করছে যেমন 'বিশ্ব জাতিসংঘ' দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিবস, বিশ্ব মাদকতা প্রতিরোধ দিবস, আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস, বিশ্বশান্তি দিবস, বিশ্ব এইড্‌স প্রতিরোধ দিবস ইত্যাদি। এসবের ফলে আদম সন্তানেরা অজ্ঞতা, গোড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা সৃষ্ট সব কূপমন্ডুকতা হতে দ্রুত মুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে মানুষের যাতায়াত ও ভাব বিনিময়ের যান্ত্রিকায়ণও 'এক জগত' গড়ার সম্পর্কে বাস্তব রূপ দেয়ার পথ প্রশস্ত করেছে। তা'ছাড়া মানবতার ঘোর শত্রু ক্ষুধা, মাদকতা, বর্ণবৈষম্য, নিরক্ষরতা, রোগ-মহামারী, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা ও গণআন্দোলন গড়ে ওঠছে। এসবই আশার কথা। সবই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সুফল। (চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

শোক সংবাদ

❑ মরহুম আব্দুল বারিক খন্দকার (মৌড়াইল, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া) সাহেবের কন্যা মনোয়ারা বেগম (৭০) গত ২০-৩-৯৮ইং শুক্রবার ভোর ৫-২০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে..... রাজেউন)। তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকল ভাই-বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছেন শেখ মোশারফ হোসেন, জেনারেল সেক্রেটারী, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া।

❑ আমার একমাত্র ছোট বোন মোসাম্মৎ উম্মে কুলসুম (৩০) জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে গত ১১-৩-৯৮ইং রাত ৩টায় ময়মনসিংহের ফাতেমা নার্সিং হোম-এ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে....রাজেউন)। সে ৪পুত্র সন্তানের জননী এবং অন্তঃসত্ত্বা ছিলো।

উল্লেখ্য, সে আমার পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলো এবং আমার কোন ভাই নেই। তার আত্মার মাগফেরাত এবং তার পুত্রদের জন্য আহমদী ভাইবোনদের কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি **হাফেজ মোঃ আব্দুর রহীম**, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ।

জুমুআর খুতবা

নিজেদের সুরক্ষার অমোঘ ঐশী ব্যবস্থা

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ইং মসজিদে ফযল লন্ডন প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল্ মায়েদার ১০৬তম আয়াত তেলাওয়াত করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۶﴾

এ আয়াতটির তরজমা হচ্ছেঃ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের (আত্মার) সুরক্ষায় যত্নবান হওয়া, যখন তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হও, তখন যে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে সে বা তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে; তখন তিনি সে-সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবেন যা তোমরা করতে।'

এ আয়াতটি থেকে আপাতঃদৃষ্টে ইহা প্রতীয়মান হতে পারে যে, অপরাপরের পথভ্রষ্টতায় কোন চিন্তা করতে হবে না, প্রকৃতপক্ষে তা কখনও বুঝায় না। কুরআন করীম এখানে একটি বিষয় নিয়েই তা পুঙ্খাণুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছে। কখনও এমন হয় যে, কেউ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, এরূপ লোকও থাকেন যারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, এরূপও থাকেন যারা জামাতের ওহ্‌দেদার (পদাধিকারী), কিন্তু তাদের মাঝে কিছু দোষ-ক্রটিও পরিলক্ষিত হয়, ওরূপ লোকদের সম্পর্কে জামাতগুলোতে প্রায়শঃ প্রশ্ন উঠে এবং পরস্পরের মধ্যে সমালোচনা ঘুরপাঁক খেতে থাকে এই বলে যে, 'ওমুক ব্যক্তি ঐ পদে আছে কিন্তু তার মধ্যে এই এই দুর্বলতা রয়েছে, ওমুক ব্যক্তিকে অকারণে (অযথা) শাস্তি দেয়া হয়েছে, ফলে সে (জামাত থেকে) বেরিয়ে গেল।' তবে অধিকাংশ জামাতই আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে সংশোধিত হয়েছে কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে এসব ফেৎনা ও বিপর্যয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই থাকে। এখানে এ আয়াতটিতে এ বিষয়টিতে জোর দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের নিজেদের (হেদায়াতের) বিষয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত। অন্যের ঝামেলার সঙ্গে তোমাদের কী সংশ্রব? তোমাদের তাতে যদ্দুর ক্ষতি হবার সম্পর্ক, যারা পেছনে সটকে পড়ে, অথবা যাদেরকে বহিষ্কার করা হয়, তেমনি পদাধিকার সত্ত্বেও যারা নিজেদের চরিত্রগত ভূমিকার সুরক্ষা করে না, তারা তোমাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। কাজেই তোমাদের কিসের বিপদ ঘটে গেলো? নিজের ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা কর। বস্তুতঃ এ আয়াতটিতে নিজেদের সম্পর্কে চিন্তাভবনার বিষয়ে এতো গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, বলা হয়েছেঃ 'আলায়কুম আনফুসাকুম' –নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া তোমাদের কর্তব্য। স্মরণ রেখো, তোমাদের ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে, তাদের ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। কাজেই নিজের সম্পর্কে যাতে এমন না হয় যে, তোমাদের জোটবদ্ধ গোটা দলই খোদাতাআলার দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য হয়ে যায়– যে-সব জোটবদ্ধতার অহঙ্কার বয়ে নিয়ে বেড়াও, যে-অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে বহিষ্কৃতদের সমর্থন এবং সর্বসাধারণের উপর এই প্রভাব বিস্তার যে, তোমরা একজোট বলে তাদেরকে দেখাও যে, তোমরা কতো বড়লোক-এহেন ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয়। এ খুতবায় আমার দৃষ্টিতে রয়েছে স্কেণ্ডেনেভিয়ার একটি দেশ। ইতোপূর্বেও আমি অনেক চেষ্টা করেছি যাতে তাদের জোট ও গাঁটছড়া ভঙ্গ হয় এবং তাদের বোধোদয় হয় যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেককেই মরতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সমীপে হাযির হতে হবে। এই সব জোট যদি বহিষ্কৃতদের সমর্থনে গঠিত হয়ে থাকে তাহলে তাতে এক কানাকড়ি উপকারও তাদের (লাভ) হবে না। জবাবদিহিতা তাদের হবেই। যদি ইহকালে না হয়, পরকালে (অবশ্যই) হবে। আজ আমি সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলতে চাই না, সাধারণভাবে এ সম্পর্কীয় বিষয়-বস্তু আমি বর্ণনা করবো। আমার ইচ্ছা আছে, যেন প্রত্যেককেই পত্র দেই। কেননা, এখন তাদের বিষয় ও অবস্থাবলী অসহনীয় হয়ে পড়েছে, সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে- অনড় অটল বদ্ধমূল গাঁটগুলো কোনক্রমেই খুলছে না। জোটবদ্ধতার অহঙ্কার বিদ্যমান। ঐ সকল হতভাগ্য লোক, যাদের মাঝে জামাতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন দলের সংখ্যাই হচ্ছে অধিক। ফেৎনা-ফাসাদ নিয়ে মত্ত জোটগুলোই বেশী, নেক-পুন্যবান লোক অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক। এই বেচারারা পড়েছে বিপদে। তারা মনে করে, কে জানে কী যেন ঘটে গেছে! প্রথমে তো তাদের কাছে আমার আবেদন যে, দেখুন! তাদের জোটগুলো আপনাদের কোনও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। হাজারের মধ্যে আপনারা যদি দশজনও হয়ে থাকেন তবুও আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদেরকে মূল্য (মর্যাদা) দিবেন। অতএব, আপনারা কেন এতো উদ্বিগ হচ্ছেন। জোট গঠিত হয়, হতে দিন। আল্লাহ্ তাদের জোট ছিন্ন-ভিন করবেন। ওরা লাঞ্ছিত হয়ে ভূমিসাৎ হবে। নিজেদের ব্যতীত অন্য কারও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না তারা। এই সুসংবাদ যখন আল্লাহ্‌তাআলা প্রদান করেছেন যে, তারা তোমাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না (লা ইয়াদুররোকুম) এবং জবাবদিহিতা তাদের অবশ্যই হবে। কাজেই, তোমরা অযথাই ভীত-ত্রস্ত এই বলে যে, "দেখুন না, আমাদের কী হবে?" তোমরা যদি শতকরা দশজনও হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের 'দশ' আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত (মকবুল), অবশিষ্ট সবাই অগ্রহণযোগ্য– তাদের কোন মূল্য নেই। তাদের জানা-ই নেই দুনিয়াতে যে কতো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে। এরূপ শত-সহস জামাত গড়ে উঠছে যারা সর্বাত্মকরূপে আত্মোৎসর্গীকৃত। কিছু বড় বড় জামাতে জোটগুলো ছিল। এখন তারা ক্ষয় হতে হতে তাদের অস্তিত্বের আর কোনকিছুই অবশিষ্ট নেই। এখন তারা বুঝে গেছে তারা নিষ্ক্রিয়। জার্মানীর অনুরূপ অবস্থাই ছিল। গোড়ার দিকে বড় রকম জোটবদ্ধতা ছিল যখন আমি জার্মানীর ব্যাপারগুলোতে বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলাম। আল্লাহ্‌তাআলা অনুগ্রহ করলেন। জার্মানীর জামাতকে যখন জাগাতে আরম্ভ করলাম তখন তাদের

ভেতরে দলাদলি ছিল। কে-ই বা তাদের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে জোটবদ্ধ প্রত্যেক দলের অহংকার থাকে। আমি তাদের উপর হস্তক্ষেপ করে দেখিয়ে দিলাম যে, যুগ-খলীফাকে যখন আল্লাহ্‌তাআলা বুঝিয়ে দেন যে, 'হস্তক্ষেপ কর', তখন তিনি হস্তক্ষেপ অবশ্যই করবেন। এমতাবস্থায় তোমাদের কোন মূল্য থাকবে না, তোমাদের অহংকার ধূলোয় মিশে যাবে। তদ্রূপই ঘটলো। সমস্ত জোট হাওয়ায় মিশে গেল। যদি কোথাও থেকেও থাকে তাহলে তা লুকিয়ে-লুকিয়ে থাকতে পারে-কারও কারও অন্তরে গাঁট বেঁধে থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ঐ সব দেশ থেকে এহেন নোংরামি দূর হয়ে গেছে। যদি কোন দেশ মনে করে যে (সেখানকার) তারা অনেক শক্তিশালী, স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী, তাহলে তাদেরকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। কুরআন করীমের এই আয়াত আমাকে শক্তি যোগাচ্ছে এবং আল্লাহ্‌তাআলার এ সকল পবিত্র বান্দাদেরকেও শক্তি যোগাচ্ছে যারা সংখ্যায় কম হতে পারেন, কিন্ত জোটবদ্ধদের চাপের মুখে আছেন। তাদের কাছে আপনাদের পক্ষে নতিস্বীকারের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই আপনারা নিজেদের পায়ের ভরে (দৃঢ়চিত্তে) দণ্ডায়মান হোন। আমার ইচ্ছা, তাদেরকে প্রথমে পত্রের মাধ্যমে সাবধান করি, বুঝিয়ে দিই যে, তাদের সব বিষয় আমার দৃষ্টিগোচরে আছে। আমি একাধিক বার সফর করেছি এবং বুঝতে পারি কে কত বড় জোটের অধিকারী এবং কিসের জন্যে তাদের অহংকার। কিন্তু আজকের খুতবায় আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, যদি তারা বিরত না হয়, তাহলে আপনারা তাদের উল্লেখ পর্যন্ত আর কখনও শুনতে পাবেন না। তারা মিটে গেছে। তাদের ব্যর্থতা অবধারিত এবং জামাত ইনশাআল্লাহ্ ঐ গুটি কয়জনের মাধ্যমেই পুনরায় উন্নতি করবে যারা জামাতের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপনা ও নেযামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল খোদাপ্রেমিক, পবিত্র ও পুণ্যবান বান্দাগণ জামাতে মজুদ আছেন। আরও যারা আত্মপর্যালোচনা করে দেখতে চান, দেখে নিন। আমিও কিন্তু স্পষ্টতঃ লিখিতভাবে সাবধান করে দিতে যাচ্ছি। এরপর তারা এর উপযুক্তই নয় যে, খুতবায় আর কখনো তাদের উল্লেখও করা হয়। আল্লাহ স্বয়ং তাদের সাথে হিসাব চুকাবেন। আপনারা দেখবেন তাদের বেরিয়ে যাবার পর ইন্‌শাল্লাহ যারা দৃশ্যতঃ স্বল্পসংখ্যক তাদেরকে আল্লাহ্ বরকত ও আশিসমণ্ডিত করবেন। এ আয়াতে করীমা এতদুদ্দেশ্যেই আমি তিলাওয়াত করেছি। এ প্রসঙ্গেই আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় উপদেশও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। কিন্তু তা ছাড়াও হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অনেকগুলো উদ্ধৃতি রয়েছে, যা প্রত্যেক জুমুআয় আমি সঙ্গে করেই আনি কিন্তু সেগুলো পাঠ করে শোনাবার মত পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না। অথচ এইসবগুলো উদ্ধৃতি-ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতে জামাতের তরবীয়তের জন্য বর্তমানকালে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিসমূহ পাঠ করে শোনানোর চেয়ে উৎকৃষ্ট অন্য কোনও পন্থা নেই। এগুলো এতো গভীর প্রভাবশালী যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হৃদয়ের গভীর থেকে নিঃসৃত কথা মানবহৃদয়ের গহীনে পৌঁছে যায়। এগুলো এরূপ একজন অভিজ্ঞ ও সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ কালাম(-বাণী), যাঁর কথার মাঝে মিথ্যা ও কৃত্রিমতার লেশ মাত্রও মিশ্রণ নেই। প্রত্যেকটি কথা যা তিনি বলেন তা অবিমিশ্র খাঁটি সত্য বলেন। হৃদয়ের উপরে এর চেয়ে প্রভাবশীল আর কী কথা হতে পারে? অতএব, এখন আমি এ পদ্ধতিটিই অবলম্বনে, যা বিগত কয়েক মাস যাবৎ অনুসরণ করে চলেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে পাঠ করে শোনাবো এবং যেখানে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে সেখানে তা উপস্থাপন করবো। তিনি বলেনঃ

"হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! এই দুনিয়া চিরকাল থাকিবার জায়গা নহে, তোমরা সাবধান হও।" কতো সত্য সরল, কতো পবিত্র এ বাক্যটি! কতো বাস্তব কথা যার মাঝে এতটুকুও অসত্য নেই! কতো বলিষ্ঠ বাক-ভঙ্গী!!-'হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! এই দুনিয়া চিরকাল থাকিবার জায়গা নয়, তোমরা সাবধান হও।' সম্বোধন করা হয়েছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরকে। হয়তো কারও মনে ধারণার উদ্রেক হতে পারে, বুদ্ধিমান লোকদের লক্ষ্য করে কেন এ কথাটি বলা হলো? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে যে 'উলুল আল্‌বাবে'র কথা বলেছেন, এখানে ঐসব বুদ্ধিমানদেরই সম্বোধন করা হয়েছে যারা উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই দুনিয়াতে ঘটমান আবর্তন-বিবর্তন দেখে আল্লাহ্‌কে স্মরণ ক'রে ঈমান ও হেদায়াতে উন্নতি করে থাকে। সেজন্য তিনি বলেছেন, **"সকল অনাচার পরিহার কর। সকল প্রকার মাদকদ্রব্য বর্জন কর। মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্য সুরা পান-ই নহে, বরং... প্রত্যেক প্রকারের মাদকদ্রব্য, যা সদা ব্যবহারের অভ্যাস করিয়া লওয়া হয় তাহা মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংস করে।"** এখানে বলেছেন, যে-বস্তু সদা ব্যবহারের অভ্যাস করা হয় মানুষ সেই অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ে। নেশার সংজ্ঞা তিনি এই করেছেন। এক্ষেত্রে মানুষ ভুলে যায়, যে-বস্তুর অভ্যাস করে নেয়া হয় তা পরিণামে ক্ষতিকর হয়। এটা এ রকম এক বাস্তবতা যা চা এবং কফির উপরেও প্রযোজ্য হয়। যে-সব লোক চা পানে অভ্যস্ত-আমিও বাহ্যতঃ তাতে অভ্যস্ত কিন্তু পরিহার করেও দেখেছি এবং স্বজ্ঞানে পরিহার করেছি। তাতে খোদাতাআলার ফযলে আমর কোনও অসুবিধে হয় নি। কফি পান করারও আমার অভ্যাস আছে, যা কদাচিৎ। মাঝে-মধ্যে পান করে থাকি। তা-ও অভ্যাসের দরুন নয়। কেননা, কদাচিতের অর্থই হচ্ছে যে, এর অভ্যাস নেই। অতএব, এ সব বিষয় আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। সুতরাং নেশার উল্লেখিত সংজ্ঞাটি যদি আপনারা দৃষ্টিগোচর রাখেন, তাহলে বহু ধরনের সমস্যা আর রোগ-ব্যধি থেকে নিরাপদ থাকবেন। বহু রকম ব্যাধিও বিভিন্ন অভ্যাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারও কোন কিছুর অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পর কোন সময় তা পাওয়া না গেলে তার মধ্যে ভীষণ এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। অতএব, আজ জগদ্ব্যাপী যে-সব অপরাধ ঘটছে তাতে গভীর দৃষ্টিপাতে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলোতে অভ্যাসের বড় রকম অংশ (প্রভাব) রয়েছে। দুনিয়ার অধিকাংশ যে-সব অপরাধ পরিলক্ষিত হয় তো অভ্যাসের দরুনই ঘটছে। ড্রাগ এডিক্‌শন ও মদ্যপান অভ্যাসই তো বটে। এসব অভ্যাস অসদাচরণ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও যৌন অনাচারজনিত বিকারগ্রস্ত সম্পর্কাবলীর সাথেও জড়িত। তাথেকে যে রোগ-ব্যাধিরও উদ্ভব হয় তা আমি বুঝেসুঝে ও বাস্তব অবস্থার সাথে মিলিয়েই আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি। মোট কথা, বর্তমান কালের রোগ-ব্যাধির সাথে মানুষের অভ্যাসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, **"প্রতি বৎসর তোমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র নেশায় অভ্যস্ত লোক এই দুনিয়া হইতে অহরহ চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে। পরকালের আযাব তো পৃথক রহিয়াছে।"** পরকালের শাস্তিকে মানুষ অনুধাবন করুক বা না করুক, ইহকালে নেশা জনিত দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তিকে অবশ্যই অনুধাবন করে। তবে তার এই জ্ঞান নেই যে, তার নেশাই তাকে বিপদগ্রস্ত করছে। তেমনি পরকালে এরজন্য শাস্তি ভোগ করবে। তাই বলেছেনঃ **"পরহেযগার ও সংযমী হও, যেন তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং তোমরা খোদাতাআলার আশিস প্রাপ্ত হও। অতিরিক্ত**

ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন অভিশপ্ত জীবন।" এখানে (শেষোক্ত বাক্যটিতে) বিশ্বের জন্য অনেক বড় একটি সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং জগদ্ব্যাপী প্রত্যেকেই যে এক পরীক্ষার সম্মুখীন তা বর্ণিত হয়েছে এই বলে যে, 'অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন অভিশপ্ত জীবন।" আজ সমগ্র বিশ্বে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়ে চলেছে, তা যে-সব জাতির মধ্যেই হচ্ছে তার জন্য অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে লিপ্ত জীবন-যাপনকারীরাই দায়ী। গরীব দেশগুলোর দিকে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি নিদেনপক্ষে জীবনের সাদাসিধে মৌলিক প্রয়োজনগুলো ঐসব দেশের সবার জন্যে নিশ্চিত করণের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহলে এটা সাম্যবাদ (Communisom) নয়, বরং কুরআন করীমের প্রথম পাঠ, কিন্তু এটিতে খারাপি নেই, নেই কাড়া-কাড়ি ও বল প্রয়োগ। বস্তুতঃ কুরআন করীমের এই প্রথম পাঠ (তথাকথিত) সাম্যবাদের সমাজব্যবস্থার চূড়ান্ত ও উচ্চতম আদর্শেরও কল্পনাতীত। পবিত্র কুরআনে প্রত্যেক মানব-সমাজের উপর আদমের জান্নাতের উল্লেখ প্রসঙ্গে বর্ণিত অবশ্য-কর্তব্যস্বরূপ ন্যস্ত করা হয়েছে এই বলে যে, সমাজের প্রত্যেকই অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান পাবে, তাথেকে কেউ বঞ্চিত থাকবে না। এই বিষয়টি ছিল মানবতার প্রথম পাঠ যা মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। উদ্ধৃতিটিতে উল্লেখিত 'সীমাতিরিক্ত' ভোগ-বিলাসে'র সীমাটি কী? তা এই সীমাটি-ই। নইলে, কোন ব্যক্তি বলতে পারে, "আমি বিলাসিতা করি বটে, কিন্তু অল্প করি।" বস্তুতঃ কোন দেশের জনগোষ্ঠীর পক্ষে (উক্ত অর্থ অনুযায়ী) সীমাতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হবার অনুমতি-ই নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের (সেখানকার) গরীবদের খবরদারি ও তত্ত্বাবধান করা হয় এবং তাদের বাধ্যতামূলক মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যে-সব ব্যক্তি মনে করে যে, খোদা তাদের প্রাচুর্য দিয়েছেন, কাজেই তারা ভোগ-বিলাসের জীবন যাপন করতে পারে, এরই নাম 'সীমাতিরিক্ত'। কেননা, কতিপয় লোকের প্রাপ্য অধিকার কতিপয় অন্যান্যের দিকে পরিবাহিত হচ্ছে–(ওয়াফী আমওয়ালিহিম হাক্কুললিস্‌সায়েলে ওয়াল মাহ্‌রূম" সূরা যারিয়াতঃ ২০- অনুবাদক)। খোদাতাআলা স্বয়ং যাদের বাঁচার যে অধিকার নির্ধারণ করেছেন তা আসলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বস্তুতঃ গরীব-ধনী (উভয় শ্রেণীর) সব দেশে এই একই অবস্থা বিরাজ করছে। কোন দেশই এই দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত নয়। অতঃপর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলছেনঃ **"অতিরিক্ত রূঢ় স্বভাবপরায়ণ ও রুক্ষ জীবন-যাপন অভিশপ্ত জীবন।"** ভোগ-বিলাসের সাথে রূঢ়তা এবং রুক্ষতা ও খোদাবিমুখতার সম্পর্ক। 'বে-মেহ্‌রি' বা রুক্ষতা ও বিমুখতার অর্থ হচ্ছে যে, পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানবজাতির প্রতি তোমাদের এতটুকু ভালবাসাই নেই যাতে তাদের দুঃখে তোমরা দুঃখিত হও– ভাবলেশহীন হয়ে পড়েছ। আর সমাজ যখন পরস্পর আলাদা ও বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে তখন অহংকারের শিকার হয়ে পড়ে। 'অতিরিক্ত রূঢ় স্বভাবপরায়ণ বলতে ঐ সব রূঢ় স্বভাববিশিষ্ট লোকই বুঝায়, যাদের নৈতিক চরিত্রকে পরীক্ষা দিতে হয় না। নিজেদের গণ্ডিতে অবস্থান করে কারও সঙ্গে তারা যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করুক না কেন, তারা মনে করে তাদের পরিচয় কেউ জানতে পারছে না এবং যা কিছু তারা করে থাকে, সে-দিকে কারও পক্ষেই অঙ্গুলি-নির্দেশের সাধ্য নেই। তিনি আরও বলেনঃ **"খোদাতাআলার প্রতি কর্তব্যপালন বা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হইতে অতিরিক্ত উদাসীন হওয়া অভিশপ্ত জীবন।"** পূর্ববর্তী বাক্যের যে-ব্যাখ্যা আমি করে এসেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সে-ব্যাখ্যাই এখানে তুলে ধরেছেন। এ বাক্যটির আরও একটি অর্থ হতে পারে যে, অতিরিক্ত এরূপ কার্যকলাপ করতে থাকা, যাতে খোদার সহানুভূতি তোমাদের প্রতি আর অবশিষ্ট না থাকে-এটাও এক অভিশপ্ত জীবন। **"খোদার হক্ এবং তাঁর বান্দার হক্ সম্বন্ধে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ঠিক সেইরূপেই প্রশ্ন করা হইবে যেইরূপ একজন ফকিরকে করা হইবে বরং তদপেক্ষাও অধিক।"** এই যে জিজ্ঞাসিত হবার ধারণা বা বিশ্বাস রয়েছে, এটি আমাদের আচরণ ও ব্যবহারিক জীবনকে সঠিক ধারায় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করতে এবং সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা, যে-ব্যক্তি মনে করে যে, সে জিজ্ঞাসিত হবে না, সে যথেচ্ছা কাজ করে বেড়ায়। এবং বর্তমান কালের এটা এক বড় ধরনের সঙ্কট যেমন কিনা আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, আমাদের জামাতেরও এ রকম কিছু লোক আছে যারা মনে করে তারা যদি পৃথক জোট পাকিয়ে নিজেদের প্রাধান্য দেখাবার প্রয়াস পায় এবং বলে বেড়ায় যে, তাদের উপর হস্তক্ষেপ করার মত কার-ই বা কী ক্ষমতা আছে–এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা বৈ অন্য কিছু নয়। বস্তুতঃপক্ষেই এমন কেউ নেই, যাকে প্রশ্ন করা হবে না। তাদের প্রত্যেক কর্ম সম্পর্কেই তারা জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং তিনি (আঃ) বলছেন, "যেইরূপ একজন ফকিরকে জিজ্ঞাসা করা হবে বরং তদপেক্ষা অধিক।" কেননা, ফকির বলতে শুধু নির্ধন ও অভাবী ব্যক্তিকেই বুঝায় না, বরং যার কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই -এরূপ নিরুপায়-অসহায় ব্যক্তিকেও বুঝায়। কিন্তু সমাজে যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে বলে বিবেচিত, যারা জ্ঞান-গরিমারও অধিকারী এবং ক্ষমতাবান (ছিল), তারা তো বরং কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হবে। অতঃপর বলেনঃ **"অতএব, সেই ব্যক্তি কত হতভাগ্য, যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ভরসা করিয়া খোদাতাআলা হইতে বিমুখ হয়** (পূর্বোল্লেখিত নিষিদ্ধ বিষয় গুলোর পরিণাম স্বরূপ শেষমেশ উক্ত অবস্থা দাঁড়ায়) **এবং খোদাতাআলার অবৈধ বস্তু এইরূপ নিঃসংকোচে ব্যবহার করে যেন সেই অবৈধ বস্তু তাহার পক্ষে বৈধ হইয়া গিয়াছে,** (অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের কোন পরোয়া না করা এবং প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণেরও পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, খোদাতাআলা থেকে ওসব ব্যতি বিমুখ হয়ে পড়ে। তারপর বলছেন, **"ক্রোধের বশবতী হইয়া পাগলের মত কাহাকেও গালি দিতে, কাহাকেও আহত করিতে ও কাহাকেও হত্যা করিতে সে উদ্যত হয় এবং কাম-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নির্লজ্জ ব্যবহারের একশেষ করে।"** এসবই খোদাতাআলার প্রতি বিমুখতারই পরিণামস্বরূপ। কেননা, যে ব্যক্তি খোদাতাআলাকে এক পরাক্রমশালী বাদশাহ্ হিসাবে জ্ঞান করে, তার পক্ষে সম্ভবই নয় যে, খোদাতাআলার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে কোনও মুহূর্ত সে ক্রোধের বশবর্তী হতে পারে এবং কখনও আবেগে এরূপ উন্মত্ত হতে পারে যে, কেউ যে তাকে অবলোকন করছেন তা সে বিস্মৃত হয়। নচেৎ "ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাহাকেও গালি দিতে, কাহাকেও আহত করিতে ও কাহাকেও হত্যা করিতে সে উদ্যত হয় এবং কাম-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নির্লজ্জ ব্যবহারের একশেষ করে। **সুতরাং মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনও সে প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে না।"** যারা দৃশ্যতঃই ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে এবং হালাল-হারামের পরোয়া করে না–হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলছেন যে, তাদের জীবনে তারা কখনও প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে না। অতঃপর তিনি বলেন, **"হে প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা অল্পদিনের জন্য এই দুনিয়াতে আসিয়াছ এবং তাহারও অনেকখানি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।** "কতো পবিত্র ভাষণ! উক্ত সব কথার পরে ছোট একটি বাক্য রেখে দিয়েছেন, যা হৃদয়ের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করে। এবং 'প্রিয় বন্ধুগণ' বলে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ তিনি তোমাদের ভালোবাসেন। সুনজরে তিনি তোমাদের দেখেন। তিনি চান না যে, তোমাদের কোন বিপত্তি ঘটুক বা কোন

দুঃখ-কষ্ট তোমাদের স্পর্শ করুক। অতএব বলছেন, "হে প্রিয়গণ! তোমরা অল্প ক'দিনের জন্যে এ দুনিয়াতে এসেছ এবং তারও অনেকখানি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।" প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ মানুষেরই অনেকখানিই সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। কেননা, এতে এই হিকমত ও তাৎপর্য রয়েছে যে, আজ নয় তো আগামীকালই তাদের মৃত্যু ঘটতে পারে তা তাদের জানা নেই। অতএব, যার মৃত্যুকাল সন্নিকট তার জীবনের তো অধিকাংশই অতিবাহিত হয়ে গেছে। যেহেতু জানা নেই মৃত্যু কখন ঘটবে সেহেতু হয়তো প্রকৃতপক্ষে তাদের অধিকাংশ জীবনকালই পেরিয়ে গেছে অথচ সে সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। অতএব তিনি (আঃ) বলছেন, **"তোমরা অল্পদিনের জন্য এই দুনিয়াতে আসিয়াছ...সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিও না।"** তাঁর কাছে তোমাদের উপস্থিত হতে হবে। তাঁকে অসন্তুষ্ট করে তোমরা কী লাভ করবে? কয়েক দিনের জীবন, কয়েক দিনের পরীক্ষা ও বিপদ-আপদ যদি তোমরা সয়ে নাও এবং এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ না কর–কেননা, অল্পই তো সেগুলো, যা কয়েকদিনেই কেটে যাবে, তাহলে পরে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন না তোমাদের প্রতি। কিন্তু যদি এ বিষয়টির দিকে তোমরা খেয়াল না কর, তাহলে খোদা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর অসন্তুষ্টির মধ্যে দিয়েই তোমরা প্রাণ ত্যাগ করবে। তিনি আরও বলেন, **"যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন মাননীয় গভর্ণমেন্ট তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে উহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।"** ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য। আল্লাহ্ তাঁর যে সব বান্দাকে রক্ষা করতে চান তাদেরকে গভর্ণমেন্ট অবশ্য ধ্বংস করতে পারে না। কিন্তু ঐ সব কোটি কোটি লোক যারা কীট-পতঙ্গের ন্যায় অসহায় জীবন যাপন করছে, যারা পূর্ব থেকেই তাদের সরকারগুলোকে তাদের খালেক ও মা'বূদ (স্রষ্টা ও উপাস্য)-স্বরূপ গ্রহণ করে বসেছে, তাদেরকে ঐসকল সরকার অনায়াসে তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করতে সক্ষম। বস্তুতঃ দুনিয়ার সমস্ত দেশের একই অবস্থা। প্রত্যেক দেশে সরকারগুলো অনুরূপ অনাচার করে থাকে যখন তারা (সরকার) মনে করে যে, অমুক ব্যক্তি বা অমুক গোষ্ঠি কিম্বা অমুক দল বা জোট –তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলবার মত উপযুক্ত নয়, তখন ওরা তাদেরকে সেভাবে পরিত্যাগ করে যেভাবে পাথর বা আবর্জনাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়। তারপর তারা উঁচু থেকে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পদতলে পিষ্ট হয়। আর এভাবে যারা বড়ো বড়ো জনগোষ্ঠি ও জোটবদ্ধ দল ছিল তাদের কোনকিছুই আর অবশিষ্ট থেকে যেতে দেয়া হয় নি। কেননা, সরকার তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাশিয়াতে অনুরূপ ঘটনাবলী ঘটেছে। আমেরিকায় ঘটছে। মোদ্দাকথা, সর্বত্র একই কাহিনী, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তুলে ধরেছেন। "তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন মাননীয় গভর্ণমেন্ট" বাক্যটিতে "অধিকতর শক্তিশালী" শব্দগুলোর প্রয়োগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় ও স্বাক্ষর বহন করে। কোন সাধারণ ব্যক্তি বলতে পারেন যে, 'সরকার তোমাদের যখন ইচ্ছা ধ্বংস করতে পারে।' কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন মাননীয় সরকার" অর্থাৎ যদি তোমাদের দলবল অনেক বড়ো হয় তাহলে সরকার তোমাদেরকে ভয়ও করে থাকে এবং ঐমতাবস্থায় সরকার ইচ্ছা করলেও ধ্বংস করতে উদ্যত হয় না এবং ধ্বংস করতে পারে না। সেজন্য দু'টি বিষয়ই সঠিক। এমতাবস্থায় তাদের মা'বূদ বা উপাস্য হয়ে দাঁড়ায় বড়ো কোন দল বা জনগোষ্ঠি এবং তারা আবার তোমাদের উপাস্য হয়ে যায়। কাজেই, তিনি (আঃ) বলেছেন, **"যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন সরকার তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে উহা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে।"** আর আল্লাহ্ কি তোমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী নহেন? সেজন্য আল্লাহ্তাআলার অসন্তুষ্টিকে কোন (জাগতিক) সরকারের সমতুল্য করো না। কোন কোন পরিস্থিতিতে এসব সরকার তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কিছুই করতে পারে না। বিরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অক্ষম থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হলে তাৎক্ষণিকভাবে, চোখের নিমিষে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। **"অতএব, ভাবিয়া দেখ, খোদাতাআলার অসন্তুষ্টি হইতে তোমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পার? যদি তোমরা খোদাতাআলার দৃষ্টিতে মুত্তাকী (খোদা-ভীরু)বলিয়া সাব্যস্ত হও, তাহা হইলে কেহই তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না।"** ব্যতিক্রমস্বরূপ এ কথাটি-ই পূর্বে আমি বলেছিলাম, পার্থিব সরকার প্রত্যেককেই ধ্বংস করতে সক্ষম বলে মনে করো না। যাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে তাদের নিশ্চয় ধ্বংস করতে পারে। প্রায়শঃ খোদার দৃষ্টিতে মুত্তাকী বলে সাব্যস্ত লোক দুর্বল হয়ে থাকেন। কিন্তু খোদাতাআলা অনুমতি (বা অবকাশ) দেন না চরম স্বৈরাচারী দোর্দণ্ড সরকারকেও তাদের ধ্বংস করবার। সামান্য ক্ষতি তারা সাধন করে থাকে, মনোকষ্ট ইত্যাদি তারা দেয়, কিন্তু ধ্বংস করতে পারে না। তবে শর্ত হচ্ছে, তোমরা যেন খোদাতাআলার দৃষ্টিতে মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) বলে সাব্যস্ত হও। **"এমতাবস্থায় তিনি স্বয়ং তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এবং যে শত্রু তোমাদের প্রাণ-নাশের চেষ্টায় আছে, সে তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। নচেৎ তোমাদের প্রাণের সুরক্ষাকারী কেহই নাই"** (অর্থাৎ তাকওয়া যদি তোমাদের মাঝে না থাকে তাহলে তোমাদের প্রাণের সুরক্ষাকারী কেউ নেই। তাকওয়া শব্দটির অর্থে হেফাযতের বিষয়-বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে–রক্ষা করা এবং রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া। **"তোমরা শত্রুর ভয়ে বা অন্যান্য বিপদাপদে পতিত হইয়া অশান্তির জীবন যাপন করিবে এবং জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখে ও ক্ষোভে অতিবাহিত হইবে।"** যদি তাকওয়া না থাকে আর অন্যান্য উপায় মজুদ থাকে তাহলে তোমাদের জীবনের উপর সেগুলোর কোন স্থায়ী সন্তোষজনক প্রভাব পড়তে পারে না। সেইসব লোক যারা দুনিয়ার ভরসায় জীবন যাপন করে– দুনিয়া বদলে যায়– যে সব লোক বড়ো-লোকের ভরসায় জীবন যাপন করে, ঐ সকল বড়ো-লোক আর বড়ো লোক থাকে না। মোটকথা, এই যাবতীয় বিষয়-বস্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উক্ত অমৃতবাণীতে অন্তর্নিহত রয়েছে এই বলে যে, তোমরা যখন জড়-পূজারীদের খোদা বানিয়ে তাদেরকে খুশী ও রাজি করার চেষ্টা চালাবে, তখন তোমাদের জীবন ভর তারা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। "এবং জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখে ও ক্ষোভে অতিবাহিত হবে।" এ বিষয়টিও তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ করা যায়। এবং বৃহৎ দেশগুলোতেও প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়া লোক যারা কোন সময় অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল– যাদের প্রতাপে জনগণ কম্পমান থাকতো, তারা জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখে ও ক্ষোভে অতিক্রম করে। তাদের এতটুকু ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট থাকে না। অস্থির ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়। যদি কেউ তাদের অন্তরে উঁকি দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে পারতো তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কথা অনুযায়ী-সেখানে দুঃখ এবং ক্ষোভ ছাড়া অন্য কিছুই পেতো না। পক্ষান্তরে, মুত্তাকীদের সম্পর্কে তিনি বলছেন, **"খোদাতাআলা তাহাদের আশ্রয়দাতা হইয়া যান যাহারা তাঁহার হইয়া যায়। অতএব, খোদাতাআলার দিকে আস।"** এর চে' অধিক নিরাপদ ও বড়ো আশ্রয়-ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?! এর চেয়ে পবিত্র ও প্রিয় ডাক ও আহ্বান আর কী বা হতে পারে? উক্ত যাবতীয় বিষয় স্পষ্টতঃ

ব্যক্ত করার পর পরিশেষে বলেন, **"অতএব খোদাতাআলার দিকে আস এবং তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিরোধভাব পরিহার কর।"** অর্থাৎ আল্লাহ্র বিরোধিতামূলক যেসব কাজ ও বিষয়গুলো ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, ও-সবই যদি তোমরা কর, তাহলে আল্লাহ্র বিপক্ষে বলে সাব্যস্ত হবে। অতএব, "তাঁর দিকে আস এবং তাঁর প্রতি প্রত্যেক বিরোধভাব পরিহার কর। **তাঁর প্রতি কর্তব্য পালনে শৈথিল্য করিও না, তাঁর বান্দাগণের প্রতি মুখ বা হস্ত দ্বারা যুলুম করিও না, এবং আসমানী কহ্র ও গযবকে (শাস্তি ও ক্রোধ) ভয় করিতে থাক; ইহাই হইল মুক্তির পথ।"**
(রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২-৭৭)

অতঃপর, কিছু অন্যান্য উদ্ধৃতি রয়েছে, যা আমি এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে চাই এবং যতক্ষণে এইগুলো শেষ হয় ততক্ষণে আমরা আরও উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে নেব। যদি জীবনভর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি অবলম্বনেই খুতবা প্রদান করা হয় তাহলে জামাতের পক্ষে এর চেয়ে সুসংবাদ অন্য কিছু হতে পারে না। এগুলো এতো প্রিয় ও মনোরম ভঙ্গীতে দেওয়া হিতোপদেশ যে, এগুলোর মোকাবেলায় অন্য কারও মুখ নিঃসৃত উপদেশ এমনই যেমন সেগুলো ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে এবং ওগুলো আকাশ থেকে। কিন্তু আসমানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এগুলো আসমান থেকে এইভাবে অবতীর্ণ হয় যেভাবে রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেনঃ **"পয়গম্বরগণ হয়ে থাকেন খোদার 'উলহীয়্যতে'র বিকাশস্থল এবং খোদার দর্পণস্বরূপ হয়ে থাকেন তাঁরা। সাচ্চা ও দৃঢ়বিশ্বাসী মুসলমান তারাই হয়ে থাকে যারা পয়গম্বরদের বিকাশস্থলে পরিণত হয়।"** নবী-রসূলগণ খোদাতাআলার উলুহীয়ত বা ঈশ্বরত্ব ও খোদায়ীর বিকাশস্থল হয়ে থাকেন এবং তাঁরা খোদাকে দেখিয়ে দেন -তাঁর সৌন্দর্য ও প্রতাপ প্রদর্শনকারী হয়ে থাকেন। আর সত্যিকার বিশ্বাসী মুসলমান তারা হয়ে থাকে যারা নবী-রসূলদের প্রতিবিম্ব ও প্রকাশ-স্থলে পরিণত হয়। এর চেয়ে খোলাখুলি ও সুস্পষ্ট মাপকাঠি আপনাদের জন্য আর কী নির্ধারণ করা যেতে পারে? পয়গম্বরদের তো সবাই জানে। কতিপয় যারা জানে না তারা মৌলবীদের অতিশয়োক্তিপূর্ণ বক্তৃতাগুলো থেকে পয়গম্বরদের সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত ধরণের কল্পনা ও ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তারা উল্লেখিত জোড় ও মিলন-সূত্রটি ভুলে যায়। তারা বিস্মৃত হয় যে, 'পয়গম্বরগণ যদি খোদার দর্পণস্বরূপ হয়ে থাকেন তাহলে তোমরা হচ্ছ পয়গম্বরদের দর্পণস্বরূপ'। ঐ সব কিছ বাস্তবতঃ করে দেখাতে হবে,– এরূপভাবে জীবন যাপন করতে হবে যাতে তোমাদের মধ্যে দিয়ে পয়গম্বরদের কথা মানুষের স্মরণ হয় (তাঁদের আদর্শের হুবহু ছবি উদ্ভাসিত হয়)। ইহা একটিমাত্র বাক্য, কিন্তু এতে সমস্ত জীবনের সারবত্তা নিহিত ও সব বৃত্তান্তই সন্নিবেশিত হয়েছেঃ "পয়গম্বরগণ হয়ে থাকেন খোদার উলুহীয়্যতের বিকাশস্থল এবং খোদার দর্পণ-বিশেষ। সাচ্চা ও দৃঢ়বিশ্বাসী মুসলমান তারা হয়ে থাকেন যারা পয়গম্বরদের বিকাশ-স্থল ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যান।" এ বিষয়টি কোন হেয়ালী কথা নয়, বরং এটি বাস্তবের সাথে মিলিয়ে, তাতে প্রয়োগ ক'রে দেখান তিনি। বলছেন, **"সাহাবা-কেরাম (রিয্ওয়ানুল্লাহি আলায়হিম) উক্ত রহস্যটি যথার্থরূপে (সম্যক) উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাঝে এতো আত্মবিলীন হন এবং তাঁর মধ্যে এরূপ 'হারিয়ে যান যে, তাদের সত্তার কোন অংশই আর অবশিষ্ট থাকে না। যারাই তাঁদের অবলোকন করতো, তারা তাঁদেরকে রসূলের মাঝে আত্মহারা ও আত্মবিভোর অবস্থায় পেতো।"** আঁ- হযরত (সাঃ)-এর সাহাবা-কেরামের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রশংসা আর হতে পারে না। "যে-কেউ তাদের অবলোকন করতো, তারা তাঁদেরকে রসূলের (সাঃ) মাঝে আত্মহারা ও আত্মবিভোর অবস্থায় প্রত্যক্ষ করতো" উভয় জগৎ পেরিয়ে তারা পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তায় (আদর্শে) আত্মমগ্ন হয়েছিলেন। **"অতএব, স্মরণ রেখো, এযুগেও যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আত্মবিভোরতা এবং আনুগত্যে আত্মবিলীনতার (পরাকাষ্ঠা) সৃষ্টি না হয় – যা সাহারা-কেয়ামের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত মুরীদান ও দৃঢ়বিশ্বাসী হবার দাবী যথার্থ হতে পারে না। যখন তা সৃষ্টি হবে, তবেই কিনা ঐ দাবী সত্য ও সঠিক বলে সাব্যস্ত হবে। এ কথাটি সর্বতঃ হৃদয়ঙ্গম করো।"** সাহাবা-কেরামের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য নিজেদের সত্তা বা স্বকীয়তার বিলোপ সাধনের যদ্দুর সম্পর্ক ছিল – তারা নিজেদের সত্ত্বা থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন, এ জগৎ-সংসার থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন, সম্মুখে তাঁদের কেবল একটি দৃষ্টান্ত ও নমুনা ছিল। আর তা ছিল কেবল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নমুনা। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, এ যুগেও, যখন আল্লাহ্তাআলা তোমাদের জন্য একজন ইমাম (আধ্যাত্মিক নেতা) নিযুক্ত করে দিয়েছেন অর্থাৎ হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ), যদি সে একই (রকম) আত্মবিভোরতা এবং আনুগত্যে আত্মবিলীনতার সৃষ্টি না হয়, তাহলে তোমরা সাচ্চা মুরীদ ও যথার্থ দৃঢ়বিশ্বাসীদের মধ্যে গণ্য হতে পার না। এখন "ইতায়াত খেমঁ গুমশুদগি" (আনুগত্যে আত্মহারা হয়ে পড়া)– ইহা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রণীত নিজের একটি পরিভাষা– অত্যন্ত প্রিয় একটি বাগ্ধারা। ইতায়াত বা আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষ নিশ্চয় হারিয়ে যায়, সেই সত্তায় আত্মহারা হয়, যাঁর আনুগত্য করা হয়। তাঁর মোকাবেলায় নিজের কিছুই আর বাকী থাকে না। নিজের নফ্স বা সত্তাকে সে বিলীন করে দেয়। যেমন কিনা দু'জন চিত্র-শিল্পীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। তাতে যে বিষয়-বস্তু রয়েছে তা উল্লেখিত আত্মবিভোরতা ও আত্মবিলীনতার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। কথিত আছে যে, দু'জন চিত্র-শিল্পীর দাবী ছিল যে, তাদের চেয়ে উত্তম শিল্পী আর কোথাও নেই। তারা সামনা-সামনি দু'টি দেয়ালে নিজেদের চিত্র আঁকতে শুরু করলো। একজন বড়ই উত্তম একটি চিত্র তার দেয়ালে আঁকলো। অপরজন তার দেয়ালটিকে পলিশ করে খুব উজ্জ্বল করে তুললো–এতো উজ্জ্বল যে, এই দেয়ালটিতে অপর দেয়ালটির চিত্র ব্যতীত অন্য কিছু দেখা যাচ্ছিল না। পলিশ ক'রে এতো চমকালো যে, কাঁচের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কাঁচেরও কোন সূক্ষ্ম পর্দা (মলিনতা) থাকে, কিন্তু এ দেয়ালটিতে কাঁচের ন্যায় পর্দাও কোনকিছু দেখা যাচ্ছিল না। তা দেখে কিছুক্ষণের জন্য তো মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবার অন্তর থেকে সহসা প্রশংসা-ধ্বনি উচ্চারিত হলো। এই গল্পটিতে যে পর্দার উল্লেখ রয়েছে অনুরূপভাবে সেই পর্দাটিকে মুছে দিতে হবে, যা মুছে দেওয়া ব্যতিরেকে সেই আত্মবিলোপ ও আত্মবিলীনতার সৃষ্টি হতে পারে না, যার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কিনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "আনুগত্যে আত্মহারা হয়ে পড়া।" এই দেয়াল যে অপর দেয়ালটির প্রতিবিম্ব হতে চেয়েছিল তার মাঝে উহা হারিয়ে গেলো এবং মাঝখানে যে পর্দা প্রতিবন্ধক ছিল তা উঠে গেল। তেমনি প্রত্যেক মানুষ এবং তার পথপ্রদর্শকের মাঝে যদি পর্দা থাকে তাহলে সে পথ- প্রদর্শকের কাছ থেকে উপকৃত হতে পারে না। যদি সেই পর্দা উঠে যায় তাহলে প্রত্যেক খারাপির আবরণ সরে যাবে এবং মানুষ হুবহু তার অনুবর্তিতায় নিজের জীবনকে বিলীন করে দিবে। আঁ হযরত (সাঃ)-এর সাথে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর সম্পর্কটিকে অনুরূপ বলেই বর্ণনা করেছেন। তিনি ঐ চিত্রকরের ন্যায় ছিলেন, যে কিনা সম্পূর্ণরূপে পর্দা তুলে দিয়েছিল। এভাবে তুলে দিয়েছিলেন যে, তাঁর আত্মা এতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে, উহার মধ্যে কেবল প্রভুরই ছবি পরিদৃষ্ট হচ্ছিল এবং নিজের ছবির কোন চিহ্ন পর্যন্ত ছিল

না। বাহ্যতঃ এই সমতুল্যতা প্রকৃতপক্ষে সমতুল্যতা নয়। কেননা, প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব হিসেবেই থাকবে; যিনি প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন তিনি-ই প্রকৃতপক্ষে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবেন। কিন্তু যে প্রতিবিম্বস্বরূপ হয়ে যায় সে-ও প্রশংসার যোগ্য বটে। এই পর্যায়ের আত্মবিলোপ তার মধ্যে সৃষ্টি হয় যে, প্রভুর মাঝে আত্মহারা হওয়ার দরুন তার মধ্যে প্রভু ছাড়া আর অন্য কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। কোন এক কবি যেমন বলেছেন, "দেল মেঁ্যা হ্যায় তসভীরে ইয়ার। জব্ চাহা গর্দন ঝুকায়ী দেখ্‌লি।" (–হৃদয়ে রয়েছে প্রেমাস্পদের ছবি, যখন ইচ্ছা মাথা নুইয়ে দেখে নেই।) এটা যদিও সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং নিম্নমানের বিষয়-বস্তু, কিন্তু যার অন্তরে মুহাম্মদ মুস্তাফা ব্যতীত অন্য কেউই যদি আর না থাকে তাহলে এর প্রকৃত ও যথার্থ মর্ম হুবহু প্রযোজ্য হবে। নিজের আত্মার দর্পণে সে যখনই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন সেখানে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেই জ্যোতির্ময় বিকাশে বিরাজমান বলে অবলোকন করে।

এরপর, এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আপনাদের কাছে এই প্রত্যাশা রাখেন যে, তাঁকে যেন আপনারা নিজেদের সম্মুখে রাখেন এবং নিজেদের পর্দা তুলে ফেলেন। দেখুন, কত কঠিন (দুরূহ), কিন্তু কত সত্য ও বাস্তবমুখী প্রত্যাশার এই বার্তাটি! এরূপ একটি বাণী যে, এর চেয়ে উত্তম বাণী আর দেয়া যেতে পারে না। বলছেন, **"মুরীদান এবং দৃঢ়বিশ্বাসী হবার দাবী তখনই সত্য ও যথার্থ হবে। এ কথাটি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নও। আল্লাহতাআলা যেন তোমাদের মাঝে অবস্থান করেন এবং খোদাতাআলার (সৌন্দর্য ও মহিমার) চিহ্নাবলী তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় –এইরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তানী শাসনের আমলদারী মজুদ রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হবে।"** এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইতোপূর্বে এখানেতো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরই কথা হচ্ছিল এবং নিজের কথা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনুগত্যের সূত্রে বলা হচ্ছিল, এরপর সহসা খোদাতাআলার দিকে বিষয়-বস্তুর মোড় কেন ঘুরিয়ে দিলেন? ইহা এইজন্য যে, তিনি (সাঃ) হলেন 'খোদা-নোমা' – খোদাকে দেখান ওরূপ দর্পণস্বরূপ। তাঁর মাহাত্ম্য এ জন্যই যে, খোদা তাঁর অন্তঃকরণে নেমে এসেছিলেন। নইলে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো একজন সাধারণ আরববাসী বলেই বিবেচিত হতে পারতেন। নইলে, দুনিয়াবাসী তাঁর কী বা পরোয়া করতো। ঐ সব সাহাবা যাঁরা শত্রু ছিলেন তাঁরা কেন তাঁর অনুগত হলেন? এজন্যই যে তাঁর (পবিত্র) সত্তার মাঝে খোদাতাআলা পরিদৃষ্ট হতে লাগলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দৃষ্টি অন্ধ বা রুগ্ন ছিল তাঁর ঐ অনন্য বিশেষত্বটি তাদের কাছে পরিদৃষ্ট হয় নি। কিন্তু যখন পরিদৃষ্ট হতে লাগলো তখন তাদের পক্ষে প্রেমাসক্ত হওয়া ব্যতীত উপায়ন্তর ছিল না। নিজেদের সত্তাকে বিস্মৃত হওয়া ব্যতিরেকে অন্য কোনও পথ ছিল না। অতএব, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বিষয়-বস্তুটির মোড় আল্লাহ্‌র দিকে এ জন্যই ঘুরিয়েছেন। কেউ যেন আবার ইহাও মনে না করে যে, তিনি নিজেকে এতো বড়ো ক'রে তুলে ধরছেন এই বলে যে, যে-কেউ তাঁর মতন হবে তো রক্ষা পাবে। কেননা, তিনি বরং প্রকৃতপক্ষে একথাই বলছেন যে, "মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মতন হবে তো রক্ষা পাবে। আমিও (মসীহ্ মাওউদ) তো ওমন ক'রেই রক্ষা পেয়েছি। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পায়রবী ও অনুসরণ করেছি, তবেই কিনা আমি তোমাদের ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হয়েছি।" তিনি বলেন, **"অতএব, এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করুন যে, আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের মধ্যে যেন অবস্থান করেন এবং তাঁর (ঐশ্বরিক) চিহ্নাবলী আপনাদের মধ্যে প্রকাশমান হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তানী শাসনের আমলদারি আপনাদের মধ্যে মজুদ আছে বলে প্রতীয়মান হবে।"** ইহা সেই শাসনের নকশা, যাকে 'আল্লাহ্‌র শাসন' বলা হয়ে থাকে। এই শাসন যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে এই শাসন-ব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ করার সাধ্য শয়তানের নেই। এখন শয়তানের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন, **"শয়তান মিথ্যা-চারিতা, যুলুম-নির্যাতন, আবেগ-উত্তেজনা, রক্তপাত, বাসনা-কামনার দীর্ঘায়ন, লোক-দেখানো ভাব ও কপটতা এবং অহংকারের দিকে ডাকে এবং এগুলোর দাওয়াত দেয়।"**

মিথ্যাচার অন্য কারো মধ্যে দেখতে পেলে তা কত-ই না খারাপ বলে বোধ হয়। নিজের সত্তাকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে অপরের দৃষ্টি দিয়ে অন্যদের মিথ্যাচারের দিকে যদি লক্ষ্য করেন, তাহলে কত-ই না ঘৃণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। আর এই মিথ্যাচারেই তোমরা নিজেরা হুমড়ি খেয়ে পড়। এটাকে চিবিয়ে-চিবিয়ে গলধঃকরণ করে থাক। এবং বিস্মৃত হও যে, এ সেই মিথ্যাচার যার প্রতি তোমাদের তীব্র ঘৃণা রয়েছে। কিন্তু অপরের মধ্যে থাকলে অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক হয়, নিজের মধ্যে থাকলে হয় না। এটাই হচ্ছে শয়তানের ধোকা। "শয়তান মিথ্যাচার, যুলুম, আবেগ, রক্তপাত, বাসনা-কামনার দীর্ঘায়ন অর্থাৎ আশা-আকাঙ্খাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকা (অর্থাৎ এরূপ বিষয়াবলীর আকাঙ্খা পোষণ করতে থাকা, যা নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যের আওতার অনেক বহির্ভূত হয়ে থাকে কিন্তু তার এ সব আকাঙ্খার কখনও অবসান হয় না), লোক-দেখানো ভাব এবং অহঙ্কারের দিকে আহবান করে এবং দাওয়াত দেয়।" এই 'দাওয়াত দেওয়া' দ্বারা কী বুঝায়? প্রকৃতপক্ষে এই দাওয়াত শয়তানের চেলাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শয়তানী-সত্তা যতোগুলোই রয়েছে তারাও এক দাওয়াত দিয়ে থাকে এবং যতগুলো এলাহী (আল্লাহ-যুক্ত) সত্তা আছেন, তারাও এক দাওয়াত দিয়ে থাকেন। সুতরাং আঁ হযরত (সাঃ)-এর সত্তা খোদাতাআলার দর্পণস্বরূপ হওয়ার দরুন ঐ সব লোক নিজেরাই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসতো যারা প্রত্যক্ষ করতো যে, তাঁর মাধ্যমে খোদার জ্যোর্তিবিকাশ ঘটছে। কিন্তু দাওয়াত শর্ত বিশেষ ছিল –এ দিকে তিনি মানুষকে আহ্‌বানও করতেন। সেজন্য এমনটি মনে করা যে, শয়তান লোকদেরকে আহ্‌বান করে না বা দাওয়াত দেয় না–এটা বস্তুতঃ অলীক ধারণা এবং আত্মপ্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়। শয়তান অবশ্য-অবশ্যই আহ্‌বান করে। সুতরাং যাদেরকে আপনারা তার দিকে আহ্‌বানকারী ও তাদের সাথীদেরকে দেখেন– তারা আপনাদের যত নিকটেই বা দূরে দূরে তাদের আহবানের কাজ করুক না কেন, তারা সবাই শয়তানেরই চেলা। অতএব, আপনাদের পক্ষে আবশ্যকীয় হচ্ছে যে, হয়তো তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, নয়তো তাদের সংশোধন-ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া। "অহংকারের দিকে ডাকে এবং দাওয়াত দেয়" –ইহা কী অর্থ বহন করে? যদি কেউ তাঁর (আঃ) উক্ত বাক্যটির তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে সে কেবল এই বাক্যটি থেকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারবে। কতো 'আরেফানা' (–জ্ঞান-তত্ত্বপূর্ণ) কালাম! একজন সত্যবাদীর মুখনিঃসৃত বাণী, যিনি সকল পথ-ঘাটের বাস্তব অভিজ্ঞতা মূলে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। ইহা নিছক কোন মৌলবীর উপদেশমূলক সামান্য কথা-বার্তা নয়। তারতো কোন মূল্যই নেই। কেননা, সে জানেই না যে, সত্যবান পুরুষগণের অন্তঃকরণে যে কতো ঐশী জ্যোতি উদ্ভাসিত হয় এবং তাদেরকে যে কী রূপ ইরফান (সূক্ষ্ম তত্ত্ব-জ্ঞান) লাভের সৌভাগ্য দান করা হয়, যাঁদের প্রত্যেক কথার প্রতিটি অংশ পরিপূর্ণ সত্যকেই বহন করে থাকে। নচেৎ, একজন উর্দুভাষাবিদ বলতে পারে এ বাক্যটি তো অযথাই অতিরিক্ত প্রয়োগ করা হয়েছেঃ "রিয়া এবং অহংকারের দিকে

ডাকে এবং দাওয়াত দেয়।" ঐ নির্বোধ কতটুকুই এবং কী বা জ্ঞান রাখে? উর্দু ভাষা যদি কারও শিখতে হয় সে যেন মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে শেখে। বস্তুতঃ প্রত্যেক ভাষায় সত্যের অভিব্যক্তিই হয়ে থাকে জ্যোর্তিময়। বস্তুতঃ উর্দু ভাষার উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যে মাকাম ও মর্যাদা রয়েছে, সেখান পর্যন্ত কখনও অন্য কেউ পৌছুতে পারবে না। এমন কি পূর্ববর্তী খলীফাগণও পৌছুতে সক্ষম হন নি – আমার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভবিষ্যতেও কখনও কোন খলীফা পৌছুতে পারবেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শান ও মর্যাদাই স্বতন্ত্র। আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলোও তাঁর উচ্চ মাকাম ও মর্যাদাপোলব্ধির দিকে পথ-নির্দেশনা দান করে। অতঃপর, তিনি বলছেন, **"এর মোকাবেলায় 'আখ্লাকে ফাযেলা' –উচ্চাঙ্গীন চারিত্রিক মূল্যবোধ ধৈর্যশীলতা, গভীর মনোনিবেশ, আল্লাহ্তে আত্মবিলীনতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, ঈমান ও ফালাহ্ (সাফল্যলাভ) – এ সব হচ্ছে আল্লাহ্তাআলার আহবান ও দাওয়াত। অর্থাৎ, এ বিষয়গুলোর দিকে ডাকা আবশ্যকীয়, এবং আল্লাহ্ সদাসর্বদা এ সকল বিষয়ের দিকেই দাওয়াত দিয়ে থাকেন। মানুষ উক্ত উভয় দিকের টানাপড়েনের মধ্যে পড়ে আছে।"** এখানে 'তাজাযব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে আকর্ষণ করার শক্তি। শব্দটিতে এ অর্থও নিহিত রয়েছে যে, পরস্পর দু'দিকে আকর্ষণ করা, যেমন দড়ি-টানাটানি হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে 'তাজাযুব'। বলছেনঃ মানুষ উক্ত খেলায় উভয় দিকের টানাপড়েনের মাঝে পড়ে আছে। **অতঃপর যার স্বভাব সৎ এবং যার মধ্যে সৎ প্রবণতার সৌভাগ্য বিদ্যমান, সে শয়তানের সহস্র আহবান এবং আবেগের তাড়না থাকা সত্ত্বেও এই সদ্চেতনা এবং সৌভাগ্য, সত্য ও শান্তির পথে পদচারণার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বরকত ও কল্যাণে আল্লাহ্তাআলার দিকে ধাবিত হয় এবং খোদা-তুষ্টিতেই প্রশান্তি ও সোয়াস্তি লাভ করে থাকে।"**

এখানে উক্ত বিষয়টির অভিজ্ঞতা প্রত্যেক মানুষের জীবনে কখনও কখনও অবশ্যই ঘটে থাকে। সচরাচর মানুষ যখন কোন মন্দ বিষয় থেকে দূরে সরে দাঁড়ায় তখন তার অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, এর ফলশ্রুতিতে নিশ্চয় সে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। এবং যে ব্যক্তি পুরাপুরি খোদার দিকে ধাবিত থাকে, তার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপেই আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি লাভ হতে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন, **"কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের স্বপক্ষে নিদর্শন বা চিহ্ন অবধারিতভাবে বিদ্যমান থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ সব নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মতৃপ্তি নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।"** সুতরাং এটা কোন কল্পনা-জল্পনার ব্যাপার নয় এই বলে যে, আপনি ওমনটিই করছেন। সুতরাং তিনি বলছেন, **"কিছু নিদর্শন আবশ্যকীয়। দেখুন, ঔষধসমূহের যথার্থতা চিকিৎসাবিদগণ সনাক্ত করে থাকেন। যেমন, বনফ্সা, খেয়ার-শম্বা এবং তুরবুদের মধ্যে যদি তাঁরা ঐ সব গুণ বিদ্যমান না পান যা অনেক অভিজ্ঞতার পর সেগুলো বস্তুতঃ সাব্যস্ত হয়েছে, তাহলে চিকিৎসক সেগুলোকে পরিত্যক্ত দ্রব্যের ন্যায় ফেলে দেয়। তেমনি ক'রে ঈমানের চিহ্ন ও নিদর্শনাবলী রয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বার বার তাঁর পবিত্র কিতাবে (কুরআন) সেগুলোর উল্লেখ করেছেন।"**

বলছেন যে, "ঐ ওষুধগুলোতে চিকিৎসক যদি ঐ সব গুণ বিদ্যমান না পায় যা অনেক অভিজ্ঞতার পর সেগুলোতে বস্তুতঃ সাব্যস্ত হয়েছে, তাহলে চিকিৎসক সেগুলোকে পরিত্যক্ত দ্রব্যের ন্যায় ফেলে দেয়।" ওষুধের পরিচিতি ঐ নামের দ্বারা নয়, যে-সব নামে ওগুলো বিক্রি হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, ঐ সব ওষুধ চিকিৎসক যখন ক্রয় করেন তখন অভিজ্ঞতা ক'রে দেখেন সেগুলো উপকারও করে কি না। যদি সেগুলোতে উপকার না হয় তাহলে ওগুলো কৃত্রিম বা অকেজো বলে সাব্যস্ত হয়। আজকাল তৃতীয় বিশ্বে ওষুধের নামে কে জানে কতকিছু কারসাজি চলে এবং ওসব ওষুধ পরিত্যক্ত দ্রব্য ও আবর্জনার স্তুপে ফেলে দেয়ার উপযুক্ত হয়ে থাকে। তেমনি ধারায় ঈমানের চিহ্ন বা নিদর্শনাবলী রয়েছে। বল্ছেন, ঈমানও কিছু নিদর্শন বহন করে। যদি তাতে ঐ সব নিদর্শন না থাকে তাহলে তোমাদের মধ্যে যে ঈমান আছে – ওটা আসলে তোমাদের একটা অলীক ধারণা ও আত্মপ্রতারণাই মাত্র। সেজন্য নিজেদের ঈমানের সেভাবে পরখ করুন যেভাবে চিকিৎসাবিদ বা ডাক্তারগণ পরখ করে থাকেন। আর সে-ঈমান এরূপ যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, কুরআন করীম উহার বার বার উল্লেখ করে। (ঈমানের) এরূপ চিহ্নাবলী তো হতে পারে না যা আপনাদের কাছে প্রচ্ছন্নই থেকে যায়, বোধগম্যই না হয়। খোদাতাআলার বাণী পাঠ করে দেখুন, তাতে বর্ণিত ঈমানের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নই সহজবোধ্য বলে প্রতীয়মান হবে। এতদ্দ্বারা নিজেদেরকে পরখ করুন। কেননা, এই 'চিকিৎসকে'র দেওয়া ওষুধ কখনও মিথ্যে হতে পারে না। তোমাদের 'সত্তা' মিথ্যে হতে পারে। একবার (রসূলুল্লাহ্ সাঃ-এর জীবদ্দশায়) মধু ব্যবহারের ব্যাপার ছিল। একজন রোগীর পেটের অসুখ ছিল। আঁ হযরত (সাঃ) তাকে আরোগ্যলাভের জন্য মধু খেতে বললেন। তারপর সে এসে বললো, 'আমার অবস্থাতো আগের মতই।' তিনি বল্লেন, "আরও মধু খাও।" আবারও সে ফিরে আসলে তিনি বল্লেন, "আরও মধ খাও।" আরও বললেন, "দেখ, তোমার পাকস্থলী মিথ্যে হতে পারে। আল্লাহ্র বাণী মিথ্যা হতে পারে না। মধুর মাঝে অবশ্যই আরোগ্য রয়েছে।" তদনুযায়ী বার বার মধু খাওয়াতে ঐ রোগী ভালো হয়ে গেল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঈমানের ঐ সব চিহ্ন ও নিদর্শনেরই উল্লেখ করেছেন যে-গুলো হচ্ছে 'লা-রায়বা' কিতাবে বর্ণিত চিহ্নাবলী'– যে কিতাবে মিথ্যা প্রবেশই করতে পারে না। ঐ সব চিহ্নই সত্য। ঐ চিহ্নগুলো নিজেদের মধ্যে তালাশ করুন। যদি ঐ সমস্ত চিহ্ন আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যায় তাহলে আপনারা যেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতিবিম্বে পরিণত হবেন। কেননা, তাঁর (সাঃ) সত্তার সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন, "কানা খুলুকুহুল কুরআন"–তাঁর চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী তো কুরআন ছিল। অতএব কীরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সরল-সোজা উপদেশাবলীর দ্বারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আপনাদেরকে কতো মহান বিষয়-বস্তুর দিকে নিয়ে যান! –এরূপ বিষয়-বস্তু যা সমগ্র জীবনকে ছেয়ে ফেলে এবং মানুষ দিশাও করতে পারে না কোন্ দিকে যাওয়ার জন্য তাকে আহ্বান করা হচ্ছে। নইলে, হয়তো ভয় পেয়ে যেতো। ফলে আগেই থেমে যেতো। অল্প-অল্প করে ক্রমশঃ সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শেষমেশ সেখানে পৌছে যায়, আর সহসা মানুষ বলে উঠে, "আহা, আমি তো অন্যভাবে ঘেরার মাঝে এসে পড়লাম। এখন তো সাধ্য নেই যে, এই বিষয়গুলোকে আমি উপেক্ষা করতে পারি।" এখান থেকে ইনশাআল্লাহ্ আগামী খুতবার বিষয়-বস্তু শুরু হবে, তবে যদি এমন কোন বিষয় এসে যায় যা মাঝখানে বর্ণনা করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। আমি আশা করি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ছোট ছোট মনোরম উপদেশাবলীর ফলশ্রুতিতে জামাত ক্রমাগত বৃহত্তরে পরিণত হতে থাকবে।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত ও অনূদিত)

মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

সদর মুরব্বী

মানবমণ্ডলী একই জাতিভুক্ত

(২১শে মার্চ '৯৮ আহমদীয়া কমপ্লেক্স মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সভায় পঠিত)

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, বিভিন্ন ধর্মের সম্মানিত প্রতিনিধি ও বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ এবং সমবেত সুধীমণ্ডলী ভাই ও বোনেরা!

আস্‌সালামু আলায়কুম।

সর্ব প্রথম ভক্তি প্রণত হয়ে পরম করুণাময়, অনন্ত ও অসীম সেই সত্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাঁর প্রশংসা কীর্তন করছি যিনি আমাদের সকলের স্রষ্টা ও প্রতিপালক।

যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও ভৌগোলিক পরিসরে আগত সকল নবী-রসূল, অবতার, ভাববাদী ও প্রতিশ্রুত ঐশী ব্যক্তিগণের প্রতি সালাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে-বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে আজকের এই শুভ অপরাহ্নে এই মহতী সেমিনারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি।

আজকের এই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সভা, এক বিশেষ মর্যাদার দাবী রাখে। এখানে আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন বিশ্বের প্রচলিত বড় বড় ধর্মীয় মতাদর্শের অনুসারী এবং নানা পথ ও মতের পণ্ডিতবর্গ, গুরুজন ও প্রতিনিধিবৃন্দ। এখানে উপস্থিত আছেন শান্তির যুবরাজ, জীবের কল্যাণের লক্ষ্যে যিনি রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করেছিলেন সেই সিদ্ধ পুরুষ সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের ভক্ত; আর্যাবর্তকে পাপমুক্তকারী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের অনুসারী; প্রেমের দূত মনুষ্য পুত্র যীশুর সেবক এদেশের গণ্যমান্য গুণীজনেরা। তাই আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে, এই আলোচনা সভা প্রেম, সম্প্রীতি, ও সৌহার্দ্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করে শান্তির পরিসরকে সুপ্রশস্ত করবে।

আমাদের আজকের শ্লোগান 'মানবমণ্ডলী একই জাতিভুক্ত' এবং 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবার' পবিত্র কুরআন মতে-সকল জাতিতেই নবী বা অবতারের (যিনি অবতীর্ণ হন) আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা নিজ নিজ জাতির ভাষায় সময়োপযোগী শিক্ষা দিয়েছেন। জগতের সকল ধর্মবিশ্বাসই একই উৎসধারা হতে নিঃসৃত। কারণ এদের উদ্দেশ্য ছিলো মূলতঃ এক-মানব তথা প্রতিটি জীবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন। কুরআন মতে সব কয়টি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। সকল প্রেরিত পুরুষকে মান্য করে যদি মাত্র একজনকে অস্বীকার করা হয় তাহলেও ঈমান পূর্ণ হবে না। তাই ইসরাঈলী সকল নবী, পারশ্য, ভারত সহ সকল স্থানে সকল যুগে আগত সকল মহান নবী-রসূল, অবতার, ঐশী পুরুষগণ আমাদের মান্যবর ও শ্রদ্ধার পাত্র। ঈমানের তাকিদেই আমরা তাঁদের মানতে বাধ্য। প্রাচীন ঋষিদের শ্লোগান চরৈবেতি'র পথ ধরেই আমরা এগিয়ে চলেছি। এ প্রগতির পথেই আমরা এ যুগের সমাগত সত্যকে গ্রহণ-বরণ করেছি। আমাদের গবেষণালব্ধ দলিল-যুক্তি-প্রমাণ ও দৃঢ় বিশ্বাস মতে এই কলিযুগের কল্কি অবতার 'বিশ্বরূপী শ্রীকৃষ্ণ', গৌতম বুদ্ধের প্রতিশ্রুত 'মৈত্রেয়', পার্শী ধর্ম শাস্ত্র যেন্দ আবেস্তায় উল্লেখিত 'নইদতি আহমদ', মনুষ্যপুত্র যীশুর পূর্বদেশে 'দ্বিতীয় বিকাশ', বাবা নানকের বলে যাওয়া প্রকৃত সিদ্ধগুরুর (মহানবীর) শিষ্য 'মাহদীমীর' এবং পবিত্র কুরআন হাদীসের

সম্মেলনে উপস্থিত আলোচকবৃন্দ ঃ ডান দিক থেকে– শ্রী অভয়ানন্দ মহাথেরো, ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আলহাজ্জ আহম্মদ তৌফিক চৌধুরী ও মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ ও ইমাম মাহদী' (আঃ) হলেন ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানে আগত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। কারণ চন্দ্র ও সূর্য যুগপৎ তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে, তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত সকল ধর্মের সকল ঐশীগ্রন্থে সকল যুগে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ শৃঙ্খলের মতো মিলে গিয়েছে এবং তাঁর মিশনের সফলতা জগতের সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে শনৈঃ শনৈঃ বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। তাঁর পবিত্র অমৃত বাণী- 'আল্লাহ্‌তাআলা আমার দ্বারা পৃথিবীতে সত্য, ন্যায় ও প্রেম প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং মানব ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে স্থায়ী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন শুধু অলৌকিক নিদর্শনসমূহ ও পবিত্র শিক্ষা দ্বারা সত্যকে জগতের বুকে প্রচার করি। আমি এ কথার ঘোর বিরোধী যে, ধর্মের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানব জাতির রক্তপাত হউক। মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং আর্যগণের সামনে আমি এ ঘোষণা করছি যে, পৃথিবীতে কেউ আমার শত্রু নন। আমি মানব জাতিকে সেরূপ ভালোবাসি যেরূপ এক স্নেহময়ী মা সন্তানকে ভালোবাসে এবং তার চেয়ে বেশী। আমি শুধু ঐ সমস্ত ভিত্তিহীন বিশ্বাসের শত্রু যদ্দারা সত্যের বিনাশ হয়। **সেই ধর্ম ধর্মই নয়, যে ধর্মের মধ্যে সার্বজনীন সহানুভূতির শিক্ষা নেই।** স্রষ্টার সৃষ্ট বস্তু হতে সকল জাতি যেমন সমভাবে উপকৃত হচ্ছে আমরাও যেন মানবজাতির প্রতি সমভাবে সৌজন্য ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করি। বস্তুতঃ

ঐশী প্রকৃতি আমাদেরকে এ শিক্ষাই দান করছে।"

বর্তমান জগতে যে সব ধর্মীয় নাম প্রচলিত থেকে আমাদেরকে বাহ্যিকভাবে পৃথক করে রেখেছে সেসব নাম ঐশী গ্রন্থভিত্তিক' নয়-তা পরবর্তীকালের প্রবর্তন। হিন্দু ধর্মভিত্তিক নয়, একটি অঞ্চলভিত্তিক নাম। সিন্ধু নদের তীরে যারা বসতি স্থাপন করেছিল পারশ্যবাসীরা তাদেরকে হিন্দু বলত; কারণ প্রাচীন পাহলবী ভাষায় 'স' বর্ণ ছিল না। পরবর্তীকালে দেশের নামানুসারে হিন্দু ও পার্শী ধর্ম পরিচিতি লাভ করে। খ্রীষ্টান ধর্ম সর্বপ্রথম 'আন্তিয়খিয়ায়' পরিচিতি লাভ করে যা খ্রীষ্টান ধর্মের শত্রুদের দেয়া নাম। প্রকৃত ধর্ম হল সনাতন ধর্ম। সনাতন মানে যা ছিল, যা আছে আর যা থাকবে। আরবীতে বলে 'দীনে হানীফ' বা 'দিনুল কাইয়্যেম' বা চিরস্থায়ী ধর্ম। এই ধর্মের উদ্দেশ্য হল সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ন্যাশ বা বিলীন করে দিয়ে, নিজের কামনা বাসনাকে নির্বাণ করে দিয়ে পরিত্রাণের পথ প্রাপ্তি।আরবীতে একেই বলে ইসলাম বা আত্মসমর্পণ।

ইসলাম কোন ব্যক্তি, জাতি বা অঞ্চলের ধর্ম নয়। ইসলাম নামটি যেমন সার্বজনীন তেমনি ইসলামের বিশ্বনবী সমগ্র বিশ্বের সকলের জন্যে প্রেরিত নবী। প্রাচীন কালে মানব জাতি সাগর-মহাসাগর, গিরি-শৃঙ্খল, মরু-সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করছিল। তাই কেউ কাউকে জানত না, কেউ কারো ভাষা বুঝত না। আর এ জন্যই তখন কোন বিশ্বনবীর আবির্ভাব হয়নি। বিশ্বের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বদৌলতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে আজ পরস্পরকে জানতে পারছে, বাক্যালাপের দিক দিয়েও একে অপরের নিকটবর্তী হয়েছে। জাতিতে জাতিতে আজ মিলন ঘটছে নানাভাবে– ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। ফলে অভিন্ন বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই অহিংসা-মৈত্রী এবং মহা মিলনের বাণী নিয়ে সকল যুগের ঐশী গুরুগণের বাণী মতে, সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদানকারী, সমগ্র বিশ্বের গ্রহণ উপযোগী শিক্ষা নিয়ে এক মহাপুরুষের শুভাগমন ঘটেছে যথাসময়ে। তিনি সকলকে একই ধর্ম-পতাকাতলে একত্রিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ধর্মের নামে যুদ্ধ রহিত করেছেন। অস্ত্র বা বল প্রয়োগের বদলে আদর্শ ও ভালোবাসাকে তিনি কার্যপন্থা নির্ধারণ করেছেন। তাঁর প্রচারের মাধ্যম তরবারী নয়, কলম। ধর্মের নামে হানাহানি, ঝগড়া, ফেসাদ দূর করে পৃথিবীর বুকে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর কাজ। এই বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তিনি ঐশী নির্দেশে সমস্ত ব্যবস্থা চালু করেছেন। তাঁরই দ্বিতীয় খলীফা আর এক ঐশী প্রতিশ্রুত পুরুষ তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণে ১৯৩৯ সালে সকল ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের মানসে এই **'আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সভা'** এর প্রবর্তন করেন। ভারতে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতি বৎসর এই দিবসটি সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে এখানে এই অনুষ্ঠান যথাযথভাবে করা যাচ্ছে না। আল্লাহ্‌তাআলার অপার অনুগ্রহে আমরা **আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠন-মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া** আজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআলার।

সমগ্র বিশ্ব আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটছে সর্বত্র। প্রকৃত ধর্মীয় নীতি ও অনুশাসন চর্চাকে পেছনে ঠেলে ধর্মের মুখোশ পরে চারদিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে একশ্রেণীর মানুষ। হিংসা-বিদ্বেষের দাবানলে সমাজ দেহ জ্বলেপুড়ে ছারখার। এ সময়ে আমাদের শান্তি প্রয়াস হয়ত অনেকের নিকট ভাল লাগবে না। কিন্তু তাই বলে আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। বিশ্বের মুক্তি ও শান্তিকামী মানুষ অহোরাত্র যে সতৃষ্ণ অন্বেষায় ছুটে চলেছে তাদের আলোকের দিশা দিতে হবে। আমরা সকল শান্তিকামী মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করব বলে দৃঢ় আশা পোষণ করি। সকল মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, প্যাগোডা এবং সকল ধর্মের সম্মানিত পুরোহিতগণকে রক্ষা করার জন্য পবিত্র কুরআন উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। **যারা ধর্মের নামে একে অপরের উপাসনালয় ভাঙতে চায় তারা ধার্মিক নয়-ধর্মের শত্রু।**

আসুন আমরা বিভেদ ভুলে প্রকৃত ধার্মিক হই। **ধার্মিক কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক কখনও ধার্মিক নয়।** আমাদের প্রত্যাশা আজকের এই শুভ অপরাহ্নের বোধোদয় সম্প্রীতি ও সন্ধির ক্ষেত্র রচনা করবে। চলুন আমরা এর ভিত্তিতে স্রষ্টার দেওয়া আমাদের সকল শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে সম্মিলিতভাবে সকলের জন্যে শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধির নিঃশঙ্ক ও সুবাসিত আবাসভূমিরূপে আমাদের পৃথিবীকে গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করি।

সবশেষে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান বিশ্ব ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর আন্তঃধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতির উপর প্রদত্ত একটি বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে শেষ করছি। তিনি বলেছেন- 'চিন্তা ধারণা ও মতামতের অবাধ আদান-প্রদানই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবাধিকার। মত পার্থক্যের পরিসর সংকীর্ণ এবং ঐক্যমতের সম্ভাবনা সুপ্রসারিত করার জন্যে সকল ধর্মেরই উচিত হবে অপরাপর ধর্মের সঙ্গে বিতর্ক সীমিত করে ফেলা কারণ 'সকল ধর্মের উৎস অভিন্ন'-কুরআন শরীফের এই ঘোষণাকে সমগ্র মানব জাতির স্বার্থে পুংখাণুপুংখভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।' তিনি আরও বলেন-'মানব জাতির পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে সকল ভালকাজে এবং পরিকল্পনায় সহযোগিতাকে বাড়াতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। যেমন-খৃষ্টান ও মুসলিম বা হিন্দু ইহুদী জাতিসমূহ একসঙ্গে মিলে মিশে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।'

পৃথিবীর বুকে শান্তির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে আমাদের সকল সহযাত্রীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমীন।

ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য
যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ ৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১২০৫৯৭, ৯১১৮৭৪৯

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর
রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য
ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

শমায়েল
হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)
(২য় কিস্তি)

তাঁর গায়ের রং

রঙ্গম চুঁ গন্দমআস্ত ও বামো ফরকে বাইয়্যেনাস্ত
যাঁ সাঁ কে আযমআস্ত দর আখবারে সারওয়ারম।

অর্থাৎ আমার গায়ের রং গোধূম বর্ণ আর (ঈসা ও আমার) কেশের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ইহা আমার নেতা (মুহাম্মদ–সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত নিদর্শনাবলীর অন্যতম।।

তাঁর গায়ের রং ছিলো গোধূম বর্ণ এবং খুবই উন্নত ধরনের গন্ধমী রং। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে এক জ্যোতিঃ ও রক্তিম ঝলক চমকাচ্ছিলো আর এ চমক যা তাঁর বদনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, সাময়িক ছিলো না বরং স্থায়ী ছিলো। কখনও কোন দুঃখ-বেদনা, পরীক্ষা, মামলা-মোকদ্দমা ও বিপদের সময়ে তাঁর রং ফ্যাকাশে হতে দেখা যেত না। সর্বদা পবিত্র মুখমণ্ডল খাঁটি সোনার মতো দেখাতে থাকতো। কোন দুঃখ ও কষ্ট ঐ চমককে বিদূরিত করতে পারতো না। এ চমক ও জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে তাঁর মুখমণ্ডলে এক প্রফুল্লতা ও মুচকি হাসি সর্বদা লেগে থাকতো এবং যারা দেখতো তারা বলতো যে, যদি এ ব্যক্তি মিথ্যেবাদী হতেন আর নিজেকে মিথ্যেবাদী বলে জানতেন তাহলে তাঁর মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা, আনন্দ, বিজয় ও প্রশান্ত-চিত্ততার প্রভাব কি করে প্রকাশ পেতো?

এ পুণ্য দৃশ্য কোন কালিমালিপ্ত হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে না। ঈমানের জ্যোতিঃ দুষ্কৃতকারীর মুখমণ্ডলে দিপ্তীমান থাকতে পারে না। আথমের ভবিষ্যদ্বাণীর দিন ঘনিয়ে আসলো। আর জামাতের লোকদের ওপরে মরা মরা ভাব ছেয়ে গেলো এবং হৃদয় হলো কঠিন দুঃখ ভারাক্রান্ত। কতক লোক অজ্ঞতার কারণে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে তার মৃত্যুর ব্যাপারে শর্ত লাগিয়েছে। চতুর্দিক থেকে নৈরাজ্যের প্রভাব বিরাজমান। লোকেরা নামাযের মধ্যে চিৎকার করে করে কাঁদছে যে, হে খোদাবন্দ! আমাদিগকে অপমানিত কোর না। মোটকথা এমনি কান্নাকাটি ও বিলাপ ছড়িয়ে পড়লো যে, অন্যদের চেহারাও ফ্যাকাশে হলে গেলো। অথচ খোদার এ সিংহ ঘর থেকে বের হন, হাসতে থাকেন। জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডাকেন। হাসাহাসি করেন। এদিকে উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত ঐদিকে তিনি বলছেন যে, চলো ভবিষ্যদ্বাণী পুরো হয়ে গেছে, ইত্তালা'আল্লাহু 'আলা হাম্মিহী ওয়া গাম্মিহী–আমার নিকট ইলহাম হয়েছে–সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে সত্যও তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে। কেউ তাঁর কথা মানুক বা না মানুক। তিনি নিজের কথা শুনিয়ে দিলেন এবং শ্রোতা তাঁর চেহারা দেখে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নিলো যে, ইহা সত্য কথা। আমরা দুঃখে মরি আর তিনি নিশ্চেষ্ট ভাবনাহীন হাসতে হাসতে কথা বলছেন। বিষয়টা এমনই যে, আল্লাহ্‌তাআলা যেন আথমের ব্যাপারে মীমাংসাটা তাঁর হাতে সোপর্দ করেছেন এবং পরে তিনি আথমের প্রত্যাবর্তন ও অস্থিরতাকে দেখে স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে অবকাশ দিয়ে দিয়েছেন এবং এভাবে সন্তুষ্ট আছেন যেভাবে একজন শত্রুকে পরাভূত করে একজন বীর পরে কেবল বদান্যতা দেখিয়ে নিজেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে যে, যাও, তোমার ওপরে করুণা করছি। আমরা মৃতকে হত্যা করা নিজের জন্য নিন্দনীয় মনে করি।

লেখরামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলে গুপ্তচরগণ তখনই কুৎসা রটনা করতে লাগলো। পুলিশের নিকট তল্লাশীর জন্যে আবেদন করা হলো। পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এক একজন করে তল্লাশীর জন্য এসে উপস্থিত হলেন। লোকদেরকে সরিয়ে দেয়া হলো। ভিতরের লোক বাইরে বাইরের লোক ভিতরে যেতে আসতে দেয়া হলো না। বিরুদ্ধবাদীদের এতই শক্তি যে, এক অক্ষরও যদি সন্দেহজনক লেখা বের হয় তাহলে ধরে ফেলে আর কি! কিন্তু তাঁর এ অবস্থা যে, ঐ খুশী ও আনন্দই তাঁর চেহারায় বিরাজমান ছিলো, আর স্বয়ং নিজে পুলিশ অফিসারদের নিয়ে নিজের আসবাবপত্র পুস্তকাদি, লেখাসমূহ আর চিঠিপত্রাদি এবং কোঠাগুলো এবং বাড়ী দেখাচ্ছিলেন। কতক চিঠি-পত্রকে তারা সন্দেহজনক মনে করে আটকও করে নেয়। কিন্তু তখনও সেই চেহারা আর ঐ মুচকি হাসি। মোটকথা না কেবল নিরপরাধ বরং একটি সুস্পষ্ট বিজয় ও ইতমামে হুজ্জত বা দলীল-প্রমাণ দ্বারা সত্যায়নের সুযোগ হস্তগত হয়। এর বিপরীতে উহার বাইরে যারা বসে আছে তাদের মুখের দিকে তাকাও তারা প্রত্যেকেই কনস্টেবলকে বাইরে বের হতে এবং ভিতরে যেতে দেখে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে যেত। তাদের রং পাংশু। তাদের ইহা জানা নেই যে, ভিতরে তো তিনি, যার সম্মানের ব্যাপারে তারা এত উদ্বিগ্ন যিনি স্বয়ং অফিসারদের ডেকে ডেকে নিজের আসবাবপত্র, নিজের লেখাসমূহ দেখাচ্ছেন এবং তার চেহারায় মুচকি হাসির রেখা এমনই যাথেকে এ ফলাফল প্রকাশিত হয় যে, এখন ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্য পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এবং আমার অবস্থা সর্বপ্রকার মলিনতা ও ষড়যন্ত্র থেকে পবিত্র বলে প্রমাণিত হবে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)
(১৮৩৫-১৯০৮)

মোটকথা সকল মোকদ্দমারই ঐ একই অবস্থা। পরীক্ষা ও তর্ক-বিতর্কগুলোতে লিপ্ত ছিলেন আর ইহা ঐ প্রশান্ত হৃদয়ের উচ্চ এবং পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত ছিলো যা দেখে বহু সম্ভ্রান্ত হৃদয় ঈমান নিয়ে এসেছিলো। (চলবে)

পরিচালক–মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকারের ভরসা

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ইং মসজিদে ফযল লন্ডন প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তাআউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযুর (আইঃ) সূরা বনী ইসরাঈলের ২০ হতে ২২ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন।

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ⑳

كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ㉑

انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ㉒

হুযুর (আইঃ) বলেন, এই আয়াতগুলি আমার আজকের খুতবার বিষয়-বস্তুর সাথে সম্পর্কিত। এই আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করবার পূর্বে আমি এই আয়াতগুলির অনুবাদ আপনাদের সামনে রাখছি। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "মান আরাদাল আখেরাতা"– যে পরকালের কামনা করে। এখানে 'যে' বলতে একবচনও বুঝায় এবং বহুবচনও। "ওয়া হুয়া সাআ'লাহা সা'ইয়াহা" এবং পরকালের জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অর্থাৎ যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে পরকালের জন্য সঞ্চয় করতে থাকে। "ওয়া মু'মিনুন" কিন্তু শর্ত এই যে, তাকে মু'মিন হতে হবে। "ফাউলায়কা কানা সা'ইউহুম মাশকুরা"– অতএব ইহাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্য মূল্য দান করা হবে। "মাশকুর" এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা বাস্তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। "মাশকুর" এর অর্থ ঐ প্রচেষ্টাসমূহ যার মূল্য প্রদান করা হবে। আমি মনে করছি, বিষয়-বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে আয়াতগুলির কিছু তফসীরও বর্ণনা করে দিই যাতে বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় বিঘ্নতার সৃষ্টি না হয়। এই জন্যে অনুবাদের সাথে সাথে আমি কিছু তফসীরও বর্ণনা করছি। "কুল্লানুমিদ্দু হাউলায়ে ওয়া হাউলায়ে মিন আতায়ে রব্বেক"– আমরা সকলকেই সাহায্য করে থাকি ইহাদিগকেও এবং উহাদিকেও। ইহা তোমার প্রতিপালকের দান। অর্থাৎ যারা চেষ্টা করে আমরা তাদের সাহায্য করি। "ওয়ামা কানা আ্যতাউ রব্বেকা মাহযুরা"– এবং তোমার প্রতিপালকের দান এমন যে, উহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। অর্থাৎ যার সম্বন্ধে তিনি ফয়সালা করে নেন যে, আমি তাকে দান করবো তার এই দান প্রাপ্তির পথে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। "উনযুর কায়ফা ফায্যালনা বা'যাহু'ম আলা বা'য"। দেখ আমরা কীরূপে তাদের একদলকে অপরদলের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। "ওয়ালাল আখেরাতু আকবার দারাজাতিওঁ ওয়া আকবারু তাফসীলা"– এবং পরকাল অবশ্যই মর্যাদায় বৃহত্তর এবং মহিমাতেও বৃহত্তর।

এই আয়াতের শুরুতে যে প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে উহা একদলের প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে প্রচেষ্টার বিষয়টিকে যখন আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো তখন দু'টি দল সামনে চলে আসলো। "মান আরাদাল আখেরাতা ওয়া সা'আলাহা সা'ইয়াহা"– যে কেউ অথবা যারা পরকালের কামনা করে এবং এই প্রচেষ্টায় নিজেকে মগ্ন করে দেয়। এমতাবস্থায় এমন লোক সকল যারা মু'মিন। "মান" যে শব্দটি মু'মিনের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে "মান"-এর অর্থ বহুবচন নেয়া হলে "মু'মিন"-এর অর্থও বহুবচনে করতে হবে। যদি "মান"-এর অর্থ এক বচনে করা হয় তাহলে "মু'মিন-এর অর্থও এক বচনে করা হবে। তবে পরিশেষে যে ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বহুবচনের ব্যবহার করা হয়েছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, "মান"-এর অর্থ হবে 'যে কেহ এমন চেষ্টা করবে।' এমন ব্যক্তিসমূহ যেহেতু সমাজে অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় সেহেতু সংখ্যাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন, "ফাউলায়কা কানা সা'ইউহুম মাশকুরা"– বাহ্যিকভাবে শুরুতে মনে হচ্ছিল যেন এক বচনের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু আয়াতের শেষ অংশ বলে দিচ্ছে যে, এক বচনের কথা নয় যারা প্রচেষ্টা চালায় তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। সমাজের ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য এখানে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যারা প্রচেষ্টা চালায় তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। বলা হচ্ছে, তাদের প্রচেষ্টাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, এখানে একটি দলের কথাই ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে, "কুল্লানুমিদ্দু হাউলায়ে ওয়া হাউলায়ে মিন আতায়ে রব্বিক।" আমরা সকলকেই সাহায্য করে থাকি, ইহাদিগকেও উহাদিগকেও। প্রশ্ন ওঠে "ইহারা" ও "উহারা" কে? ইহার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে "উনযুর কায়ফা ফায্যালনা বা'যাহুম 'আলা বা'যিন" দেখ আমরা তাদের একদলকে অপরদলের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। সুতরাং যে কেউই আখেরাতের জন্য প্রচেষ্টা চালায় তাদের মধ্যে একদল কম কল্যাণপ্রাপ্ত বলে মনে হচ্ছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা তাদের যে রিযিক প্রদান করেন উহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা, দৈহিক-শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও ধন-সম্পত্তি কম দান করা হয়। এবং কিছু লোক এমন হয়ে থাকে যাদেরকে অন্যদের উপরে (এ সকল বিষয়ে) প্রাধান্য দান করা হয়। আল্লাহ্ বলছেন, এ দু'টি দলকেই আমরা সাহায্য করে থাকি। অর্থাৎ এ দু'টি দলকেই আমরা সাহায্য করবো। যদি এ সকল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলার জন্যে চেষ্টা করে, আখেরাতকে সামনে রাখে ও তার জন্যে পরিশ্রম করে তবে এই রাস্তায় যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তা দূর হতে পারে। এবং যতক্ষণ আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হতে সাহায্য না পাওয়া যাবে ততক্ষণ এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা যাবে না। "উনযুর কায়ফা ফায্যালনা বা'যাহুম আলা বা'যিন" এর মধ্যে এক ইঙ্গিত এই-ও রয়েছে যে, পৃথিবীতে

দু'টি দল থাকে। একতো তারা, আল্লাহ্‌তাআলা যাদের প্রাধান্য দিয়ে থাকেন আরেক দল হলো তারা যাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। সুতরাং এ পৃথিবীতে যখন এ দু'টি দল পরস্পরের মুখোমুখি হয় তখন এর ফলে পাপের জন্ম হয়। আর এই পাপের অনিষ্ট হতে বাঁচার একমাত্র রাস্তা হলো দোয়া। মানুষের নিকট দোয়া ছাড়া এই অনিষ্ট হতে বাঁচার অন্য আর কোন শক্তি নেই। ইহা একটি দীর্ঘ বিষয়-বস্তু তাই আমি ইহার বিতর্কে যাব না।

যাই হোক আমি উপরোক্ত আয়াতকে জামাতের তরবীয়তের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও পাথেয়রূপে পেয়েছি। খুতবার মাঝে-আমি যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতিসমূহ পাঠ করব তখন আপনারা সেই উদ্ধৃতিসমূহকে এই আয়াতের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত পাবেন। এই ভূমিকা দেবার পরে আমি সুইডেন জামাত সম্বন্ধে কিছু বলবো। আমি পূর্বে এই জামাতের কথা আকারে ইঙ্গিতে বলেছি। তবে গত খুতবায় আমি তাদের কথা আরো স্পষ্টভাবে বলেছি। যেহেতু আমার নিয়্যৎ সম্পূর্ণরূপে আখেরাতের (জন্যে প্রস্তুতি করানোর) উদ্দেশ্যে ছিল। আল্লাহ্‌তাআলা জানেন ইহার (নিয়্যতের) সাথে যতটুকু দোয়া করার সাধ্য ছিল আমি ক্রমাগতভাবে তা-ও করেছি। এজন্যে আমি এ বিষয়ের সাক্ষী যে, "ফাউলায়কা কানা সা'ইউহুম মাশকুরা" অর্থাৎ এমন লোক যারা আখেরাতের জন্য চেষ্টা করে আল্লাহ্‌তাআলা অবশ্যই তাদের সাহায্য করেন এবং তাদের চেষ্টা বিফলে যায় না। আজ আমি এই আয়াতকে (বাস্তবায়িত হবার) সাক্ষী হিসাবে তুলে ধরছি। সুইডেনে হারিয়ে যাচ্ছিল এমন পরিবারসমূহ যাদের নাম আমি উল্লেখ করিনি তারা আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে জামাতের দিকে ফিরে এসেছে। তারা (জামাতের দিকে) ফিরে আসার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তাহলো এই যে, তারা তওবা করেছে। এই বিষয়টি তাদের পত্রাদি, যা আমার হস্তগত হয়েছে তা হতে প্রকাশিত। এ জন্যে আমার হৃদয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তারা সত্যিকারের তওবা করেছে এবং ইনশাল্লাহ্ আগামীতে তারা আমাকে আর কষ্ট দেবে না। তাদের চিঠি পড়ে আমি যে আনন্দ অনুভব করেছিলাম তা আমার সকল যন্ত্রণাকে প্রশমিত করে দিয়েছে। আর যখন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ঐ হাদীসে কুদসী আমার মনে পড়লো যাতে তওবাকারীদের সাথে আল্লাহ্‌তাআলার ব্যবহারের কথা বর্ণিত হয়েছে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন যে, অনেক সময় কোন ব্যক্তি মরুভূমিতে বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়ে, তার উটটিকে, যার উপর তার সফরের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে উহাকেও সতর্কতার সাথে বেঁধে রাখে। কিন্তু বিশ্রাম নেবার পর সাঝ বেলায় যখন সে উঠে, সে দেখতে পায় যে, তার উটটি নেই। তার সকল জিনিসপত্র অদৃশ্য হয়ে গেছে, মরুভূমিতে তার জীবনের জন্যে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু অর্থাৎ পানি উহাও উটের সাথে চলে গেছে। এমতাবস্থায় সে মরুভূমির চতুর্দিকে বার বার ফিরে তাকায় যে, কোথাও সেই উটের ফিরে আসার চিহ্নাবলী দেখতে পাওয়া যায় কি না?

খোদাতাআলার কথা স্মরণ করে আমার হৃদয় আবেগে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে যে তিনি কীভাবে তাঁর বান্দার প্রত্যাবর্তনের জন্য তাকিয়ে থাকেন। যারা তওবার মুখাপেক্ষী তারা যদি জানতেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা এভাবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন তাহলে অধিকাংশরা তাঁর (আল্লাহর) দিকে দ্রুত দৌড়ানো শুরু করতো। তওবাকারী ও তওবা গ্রহণকারীর মধ্যকার এতো চমৎকার সম্পর্কের দৃষ্টান্ত আপনারা কোথাও খুঁজে পাবেন না। ঐ বান্দা যে মুখাপেক্ষী, নিরূপায় ও অসহায় তার মনে (তার সহায়-সম্পদ) হারিয়ে যাওয়া বান্দার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার কষ্ট হয়। আর তা এই অর্থে যে, বান্দার পথভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি (আল্লাহ্) আফসোস করেন। আমরা ইহা বলতে পারি না যে, আল্লাহর কোন মন আছে, বা তাঁর নষ্ট হয়ে যাবার কষ্টের অনুভূতি আমাদের অনুভূতির মতো। হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম দৃষ্টান্তরূপে আমাদের সামনে উহাই তুলে ধরেছেন যার অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই আছে। আর আমরা যেন জেনে নেই আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের চাইতে অনেক বেশী মূল্যায়নকারী, আল্লাহ্‌তাআলা তার হারিয়ে যাওয়া বান্দার জন্য উহার চাইতে বেশী কষ্ট অনুভব করেন যা কেউ মরুভূমিতে তার বাহন যার উপর তার জীবনোপকরণ রয়েছে, হারিয়ে গেলে কষ্ট পেয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার তো কোন জীবনোপকরণ নেই যা তার হারিয়ে যাওয়া বান্দার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ্‌তাআলা তো কারো মুখাপেক্ষী নন। সমগ্র জগতও যদি তাকে অস্বীকার করে তবুও তাঁর কোন পরওয়া নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও (তাঁর বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার) এমন ভালোবাসা! ইহাই হলো (সেই হাদীসের) মূল বাণী। জগৎ তো তার হারিয়ে যাওয়া জীবনোপকরণের মুখাপেক্ষী; কিন্তু তিনি (আল্লাহ্) তো কারো মুখাপেক্ষী নন। সমগ জগৎ তাঁরই মুখাপেক্ষী। তাই সমগ্র জগৎ যদি তাঁকে পরিত্যাগ করে তবুও তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম যে বিষয়টি আরও বর্ণনা করছেন তা হলো এই যে, এ জগতে জীবনের সঞ্চয় হারানোর পর বান্দার মনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়ে থাকে অনুরূপ আলোড়ন বান্দার মনে যেন খোদার জন্যে সৃষ্টি হয়। হাদীসের মূল আহ্বান হলো এই যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। এই বাণীর মুল যদি ভলোবাসা না হয় তবে বিষয়-বস্তুটি অস্পষ্ট থেকে যেত। উটের অপেক্ষাকারীর অপেক্ষাতো তার অসহায়ত্বের জন্য, তা জীবন বাঁচানোর জন্যে আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বকে টিকে থাকার সাথে তাঁর হারিয়ে যাওয়া বান্দাদের কিসের সম্পর্ক। তবে হ্যাঁ, বান্দাদের বেঁচে যাওয়া তার নিকট উত্তম। যেমন কেউ তার হারিয়ে যাওয়া প্রেমিককে খুঁজে পায় এতদ্‌সত্ত্বেও যে, প্রেমিকের জীবন তার উপর নির্ভরশীল। তবুও সে তার প্রেমিকের জন্য উৎকণ্ঠিত। যাই হোক ইহার (হাদীসে কুদসীর) মূল বাণী অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য ও সম্মানিত। **প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত যে, তার এক খোদা আছে। যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি প্রতিপালনকারী ও যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি আমার পথভ্রষ্ট হওয়াতে অমনভাবে দুঃখিত হন যেন তিনি আমার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এমন ব্যক্তি যদি প্রত্যাবর্তন না করে তবে কুরআন ও হাদীস হতে জানা যায় যে, খোদাতাআলা মুখাপেক্ষীহীন তিনি কোন্ পরওয়া করবেন না। আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি হবে না।** এইভাবে যখন আমি নসীহত করি ও চেষ্টা করি যে, জামাতের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা ফিরে আসুক, তখন জামাতের ক্ষতিকে সামনে রেখে কখনও তা করিনি। আমি জানি যদি এমন লোক সকল যদি আমার নসীহত না মানে এবং প্রত্যাবর্তন না করে তবে সে শুধু নিজের ক্ষতি করবে। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, জামাতের কোন ক্ষতি হবে না। আমার প্রচেষ্টার মূল ইহাই।

আমাকে এভাবে চেষ্টা করতে হবে ও করেও থাকি। তাই আপনাদিগকে আমার এ প্রচেষ্টায় সাহায্যকারী হতে বার বার আহ্বান জানাই। অতএব উপরোক্ত হাদীসটির মূল বাণী ও দর্শনকে মনে রাখুন। যদি আপনারা হাদীসটির মূল বাণী ও দর্শনকে বুঝে যান তাহলে এ ব্যাপারে আপনাদের মধ্য হতে তারাই আমার সাহায্যকারী হবে যারা মানবজাতিকে ভালোবাসে। **যাদের মনে মানবজাতির ভালোবাসা নেই, সম্পর্ক নেই, তাদের মনে আমার নসীহতের বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না। কেননা, এই বিষয়টি ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির সাথে ভালোবাসা। অনুরূপভাবে আপনার খোদার বান্দাদের ভালোবাসার কারণে তাদের দুর্বলতা আপনাকে ব্যথিত করে তুলবে।** আর এই ব্যথিত হওয়াই আপনার দৃষ্টিকে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে বাধ্য করবে যে, যা হারিয়েছে উহার প্রত্যাবর্তনের কোন চিহ্ন দেখা যায় কি না। ইহাই হলো গোটা জামাতের তরবীয়তের চাবিকাঠি। আপনি যদি কাউকে হারিয়ে যেতে দেখেন এবং এর ফলে আপনার মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়, ক্রোধের সৃষ্টি হয় অথবা অবজ্ঞার সৃষ্টি হয় যে, সে তো এক নিম্নমানের পুরুষ বা স্ত্রীলোক সে যদি হারাতে চায় হারিয়ে যাক, তবে আপনি অহংকারী। আপনার নিজেরই প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করা উচিত। **আগে আপনাকে খোদার দিকে ফিরে আসতে হবে নতুবা যারা হারিয়ে যাচ্ছে আপনি তাদের খোঁজে বের করতেই পারবেন না।** তরবীয়তের পথে আমার জন্যে সবচেয়ে বড় অন্তরায় ইহাই যে, তরবীয়ত করার সময় বড় বড় নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ও কর্তাকর্তৃগণ সংশোধনযোগ্য ব্যক্তিদের বিপক্ষে নিজদিগকে শ্রেয়ঃ মনে করে থাকেন। কিন্তু তারা একথা বুঝতে চেষ্টা করেন না যে, তারা তাদের ভালোবাসার কারণে সংশোধন করার চেষ্টা চালাতে বাধ্য। **ভালোবাসা যত বেশী হবে ততই উঁচু ও নিম্নের ভেদাভেদ মিটে যাবে।** ইহা সেই বিষয়-বস্তু যাকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর মালফুযাতে আরও বেশী স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ঘটনাটি সুইডেনে ঘটেছে উহার সম্পর্ক যদি এরূপই হতো! জামাতের জন্য এরা অপরিহার্য ছিল না। এদের ব্যতিরেকেও জামাত চলতে পারতো। কিন্তু তাদের জামাতের প্রতি ভালোবাসা ও নেযামে জামাতের তাদের প্রতি ভালোবাসা আবশ্যকীয় ছিল। আর ইহার জন্যেই আমরা চেষ্টা চালিয়েছি। বছরের পর বছর আমি চেষ্টা করেছি তারা যেন তাদের নিজেদের প্রয়োজনকে বুঝার সৌভাগ্য পায়।.তারা যেন বুঝে নেয় জামাতের নেযামের এক মর্যাদা রয়েছে। **নেযামে জামাতের মর্যাদার পথে যারা অন্তরায় যারা বেহুদা কথাবার্তা বলে, অভদ্রতা করে তাদের সাথে সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন করে ফেলা** উচিত। এবং (আমি মনে করি) তাদের হৃদয়ের অভিব্যক্তিও এরূপই হবে। আর এই বিষয়টি যে, কেউ নেযামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, ইহার অবমাননা করে তবে এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে আপনাদের হৃদয় সেই (মরুভূমিতে) হারিয়ে যাওয়া উটের (মালিকের) ন্যায় ব্যথিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমতাবস্থায় আপনাদের পথ নির্দেশনাদানকারী হিসাবে ঐ আয়াতটি সামনে থাকা উচিত সেখানে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, যদি আমার ভালোবাসা সত্ত্বেও কারো পরওয়া না করে তবে আমারও তার কোন পরওয়া নেই। সে যেখানে ইচ্ছা যাক পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াক আমার তার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং যে পবিত্র পরিবর্তন সেখানে ঘটেছে, যার উল্লেখ আমি করেছি তা আমার জন্যে অত্যন্ত আনন্দের কারণ। তবে কিছু লোক এমন রয়েছে যাদের অপরাধ নেযামে জামাত ও ইহার অবমাননার কারণে অত্যন্ত জঘন্য। আমরা কখনো পসন্দ করবো না যে, তারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতের মসজিদে আসা যাওয়া করুক এবং পরিবেশকে নষ্ট করুক। আজকের দিনে এক সাধারণ ক্ষমারও ঘোষণা হবে। এবং ইহার সাথে **আজ হতে ঐসকল লোকদের মসজিদে আসা নিষিদ্ধ হবে যাদের সম্বন্ধে নেযামে জামাতকে জানানো হয়েছে। তারা এবং ঐসকল লোক যাদের সাথে উঠাবসা করতো, যাদের সামনে জঘন্য ধরনের কথাবার্তা বলতো, তাদের এদের (এমন অভদ্র লোকদের) উপর প্রভাব ছিল। তবুও তারা কোন পরওয়া করেনি যে, এদের বিরত করি।** ইহারা আজকের সাধারণ ক্ষমার বহির্ভূত। তাদের কোনরূপেই এই সুযোগ দেওয়া হবে না যে, তারা আমাদের মসজিদের পরিবেশকে নোংরা করুক। আগামীতে কি হবে ইহার ফয়সালা আল্লাহ্‌তাআলা করবেন, তবে ইহাই হলো আজকের খুতবার বিশেষ ঘোষণা। (সুইডেন) জামাত এই খুতবা শুনছেন তারা যেন বিষয়টিকে ভালোভাবে স্মরণ করে নেয়। আমি মনে করি এই সময়ে যেহেতু এক নতুন ব্যবস্থাপনা চালু করা হচ্ছে এবং নতুন কর্মকর্তাদের প্রয়োজন হবে তাই আমার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আজ অথবা আগামীকাল সময় সুযোগ অনুযায়ী নতুন নির্বাচন সম্পাদিত হোক। নতুন নির্বাচনের সময় তো এমনিতেই হয়ে এসেছে। তবুও যেহেতু ইহা এক নতুন আধ্যাত্মিক জন্ম তাই নির্বাচনটি এখনই করিয়ে নেয়া উচিত। নির্বাচনটি যেন বিলম্বিত করা না হয়। এই নির্বাচনের সম্বন্ধে আমি যা বলছি তা যেন সুইডেনের জামাত মনোযোগ সহকারে শুনে। নিয়ম হলো এই যে, যেখানে ইমারত কায়েম থাকে সেখানে মজলিসে শূরার প্রতিনিধিবৃন্দ জামাতসমূহ থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং তারা এই (আমীর ও ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা) নির্বাচন করে থাকেন। যদিও জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনায় আমার অধিকার রয়েছে যে, সাময়িকভাবে এই বিধি-বিধানগুলিকে স্থগিত করে দিই এবং তরবীয়তের রূহকে সামনে রেখে ব্যতিক্রমধর্মী ফয়সালা করি। তবে আমি সম্পূর্ণরূপে এই বিধি-বিধানকে পরিহার করতে চাই না। ইহাই অত্যন্ত উত্তম পদ্ধতি যে, জামাতের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ জামাতের আমীর ও মজলিসে আমেলার নির্বাচন করুক। কিন্তু এতে যতটুকু সময় লেগে থাকে আমি তা সংকুচিত করে দিচ্ছি। তাই আপনাদের যে সমস্ত জামাতে আমার আওয়াজ পৌঁছাচ্ছে তারা বিশদিন বা একমাসের নোটিশের প্রয়োজনের অপেক্ষা না করে আজই নিজেদের মধ্য হতে মুত্তাকী ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত করে গেটেনবার্গের দিকে রওয়ানা করিয়ে দিন। যদি আজ সম্ভব না হয় তবে আগামীকাল পর্যন্ত যেন তারা সেখানে পৌঁছে যায়। যাতে করে গোটা সুইডেনের প্রতিনিধিত্বে তাদের পরবর্তী মজলিসে আমেলার নির্বাচন সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ সার্বভৌম মজলিসে আমেলার নির্বাচন। আশা করি আমার এ নির্দেশকে তারা অবহেলা করবে না। এবং ইনশাল্লাহ্‌তাআলা এ সকল প্রতিনিধিবৃন্দ সেখানে একত্রিত হয়ে যাবেন। **নতুন করে সেখানে যে ক্ষেত্রে প্রাণের সঞ্চার করতে হবে তাহলো ভালোবাসার সেতুবন্ধনকে সম্প্রসারিত করতে হবে, তা পূর্বের সকল পঙ্কিলতাকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেয় যেন কিছুই ছিল না। স্নেহ-মমতার সূত্রে যেন এই ব্যবস্থাপনাকে**

মজবুত সুতোয় গেঁথে নেয়। যদি কখনো কোন ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে এই উদ্ধৃতিগুলি মনে করে নিবেন যা এখন আমি আপনাদের সামনে পাঠ করে শুনাচ্ছি।

গত খুতবা যখন শেষ হয়েছিল তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি পাঠ করেছিলাম। যা অবশিষ্ট আছে সেখান হতে আমি পাঠ করে শুনাচ্ছি। তিনি বলেন, "মানুষ অনেক আশা-আকাঙ্খা করে থাকে কিন্তু অদৃশ্য ও নিয়তির সংবাদ কে জানে? জীবন আশানুযায়ী বয়ে চলে না।" ইহা জামাতের জন্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণী ও উপদেশ। আপনাদের আশা-আকাঙ্খার ক্ষমতাই নেই যে, আপনাদের জীবনকে ছন্দায়িত করবে। হাজারো আশা জন্ম নেয় হাজারো আকাঙ্খা মানুষ করে থাকে কিন্তু তদনুযায়ী জীবন গতিময় হয় না। গোটা পৃথিবীর সমাজ আজ অশান্তিতে রয়েছে। আশা-আকাঙ্খার যদি জীবনকে নিজের মত গড়ে তোলার শক্তি থাকতো তবে পৃথিবীতে একজনকেও অশান্ত পাওয়া যেত না। পৃথিবীর বড় বড় সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানগণ এবং সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিও হৃদয়ে অশান্তি অনুভব করছে। ইহা প্রকাশ করুক বা না করুক তবে যখনই প্রকাশের সময় হয় তখন তাদের কাছ থেকে শোনা যায়, তারা অশান্তিতে ভুগছে। বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ আমেরিকাকে মনে করা হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের অবস্থা দেখুন। তিনি কোন্ ধরনের অশান্তিতে নিপতিত হয়েছেন। ইরাকের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের যে প্রতিক্রিয়া ছিল তাতে ইহা অসম্ভব নয় যে, সে নিজে অশান্তি হতে বাঁচার জন্যে এ সকল পদক্ষেপ নিয়েছে। বরং প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ইরাকের সম্বন্ধে বিবৃতি দেবার পর আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ইহাই ছিল। তার উপর যে নোংরা আক্রমণ করা হয়েছে, যদি ইহার তদন্ত ইনসাফের সাথে করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে অনেকের ধারণা যে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট হবার যোগ্য থাকবেন না। আমেরিকার কতিপয় নামকরা উকিলের ধারণা যে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে যদি তা প্রমাণিত হয় যার সম্বন্ধে খুব বেশী আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, তা প্রমাণিত হয়ে যাবে, তাহলে তাকে জেলে পাঠানো যেতে পারে। জাগতিক দিক হতে এক উন্নততম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের এই অবস্থা যে, তার ঘাড়ে একটি তরবারী ঝুলছে। তিনি জানেন, যদি যথাযথভাবে আইনের তৎপরতা চলে তবে ইহা অসম্ভব নয় যে, রাষ্ট্রপ্রধানের প্রাসাদ হতে তাকে জেলখানার কুঠরীতে যেতে হবে। তাঁর হৃদয় তো অশান্তিতে রয়েছে। তার আশা-আকাঙ্খা তার কোন কাজে আসবে না।

সুতরাং আমার প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, ইরাকের বিরুদ্ধে তার এ অভিযান মূলতঃ জাতির দৃষ্টি ফেরানোর জন্যে এবং পুনরায় জাতির 'হিরো' হবার জন্যে। সাথে এই ফায়দা লুটার জন্যেও যে, জাতি তাকে অপরাধী মনে করলেও যেন এ সময়ে তারা জাতীয় হিরোর উপরের ঝুলন্ত বিপদাবলীকে দূরীভূত করে দেয়। আর আমার এই ধারণার স্বপক্ষে আমেরিকার অনেক জ্ঞানী-গুণী রয়েছেন। তারা বলছেন, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের এই মুহূর্তে বেঁচে যাওয়া আসলে ইরাকের বিরুদ্ধে নেয়া পদক্ষেপের কারণে। অধিকাংশ লোক যারা ইরাকের বিপক্ষে এই প্রেসিডেন্টের সমর্থন করছেন, যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনারা প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে ঐ বিষয়ে (যৌন কেলেঙ্কারী) অপরাধী মনে করেন কিনা? তারা বলেন, হ্যাঁ, আমরা (অপরাধী) মনে করি তবে আমরা ইহার পরওয়া করি না। রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূমিকা এত ব্যাপক যে, এই সকল নৈতিক বিষয়াবলীতে সে শাস্তির যোগ্য কি না এ নিয়ে আমরা ভাবি না। ইহার এক কারণ তো এই যে, গোটা আমেরিকার নৈতিক অবস্থার অধঃপতন ঘটেছে। এবং এই নৈতিক অধঃপতনের ফলে নৈতিক দুর্বলতা দ্বারা ঐ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় না যা আজ হতে পঞ্চাশ বা একশ' বছর পূর্বে হতো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "আশা ও আকাঙ্খা দ্বারা তোমাদের জীবনে গড়ে ওঠে না। আশা-আকাঙ্খা দ্বারা যদি জীবন গড়তে তবে পৃথিবীতে কাউকেও অশান্ত পাওয়া যেত না।" এখন প্রশান্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইহা অনুধাবন করার বিষয় যদি অনুসন্ধান কর ও তন্ন তন্ন করে খোঁজ তবে জানা যাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই দুঃখ-বিপদের মধ্যে আছে। দোয়ার যে সকল চিঠি-পত্র আসে যদি কেউ ঐগুলিকে এক নজর দেখে তবে সে ইহা অনুমান করতে পারবে। (অর্থাৎ মানুষ যে কতপ্রকার দুঃখ-কষ্টে আছে)। একবার আমি ডাক দেখছিলাম তখন আমার মেয়ে কথা বলার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। সে বলল, "আব্বা! আপনি প্রতিদিন এতগুলো ডাক (চিঠি-পত্র) দেখে থাকেন! আমি তো সারাজীবন লিখলেও এইসকল চিঠি-পত্রের উত্তর দিতে পারবো না। ইহা একটি পৃথক বিষয়। তবে আমি যে বিষয়টি বলতে চাই, তাহলো এই যে, সকল চিঠি-পত্র অশান্তিতে পূর্ণ। কেউ এই অশান্তিতে আছে; কেউ অমুক অশান্তিতে আছে আর এই সকল অশান্তির আশা-আকাঙ্খার অসফলতার সাক্ষ্য বহন করে। যাই হোক হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, মানুষ অনেক আশা-আকাঙ্খা পোষণ করে থাকে, কিন্তু অদৃশ্য ও নিয়তির সংবাদ কে জানে। অদৃশ্য হতে আল্লাহ্তাআলার যে লিখন প্রকাশিত হয় তা কে জানে। "জীবন আশা-আকাঙ্খানুযায়ী গতিময় হয় না। আশার শৃঙ্খল ভিন্ন এবং নিয়মিত শৃঙ্খল ভিন্ন।" কেমন সহজ-সরল বাস্তব বর্ণনা যা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়া এ সরল বর্ণনা সর্বদা বিস্মৃতও হয়ে যায়। ইহা সেই দুর্ভোগ যা তরবীয়তের পক্ষে অন্তরায়। এমন লোক যারা আমার খুতবা খুব মনোযোগ সহকারে শুনে যে, মিথ্যার কাছে যেও না; এই করতে হবে, ঐ করতে হবে, এবং তারা মনে-প্রাণে মাথা নাড়িয়েও বলে আমরা এরূপ করবো না। কিন্তু তারা যখন ফেরত যায় তখন তারা বুঝতেই পারে না যে, তারা মিথ্যা বলছে। কেননা, মিথ্যার অভ্যেস তাদের মধ্যে এত গভীর যে, কোন না কোন সময়ে কোন না কোন বাহানায় মিথ্যা অবশ্যই মাথাচাড়া দেয়। মিথ্যার বিরুদ্ধে যে জেহাদ রয়েছে তাতে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। আর ইহা সেই জেহাদ যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হৃদয়ে করতে হবে। এই দিক হতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অন্যান্য লেখা এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তিনি (আঃ) বলেন, "সত্য শৃঙ্খল উহাই যা কাযা ও কদরের (নিয়তি) শৃঙ্খল। খোদার নিকট মানুষর জীবন-বৃত্তান্ত সত্য।" এক জীবন-বৃত্তান্ত হলো যা আমরা এ পৃথিবীতে লিখি ও পড়ি। অমুকের জীবন-বৃত্তান্ত তমুকের জীবন বৃত্তান্ত এবং ইহাতে অনেক শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসার সাথে অতিশয়োক্তির সাথেও কিছু বিষয়কে গোপন করে এক মরহুমের যিক্রে খায়ের (ভালো দিকের আলোচনা) পাওয়া যায়। কিন্তু নিঃসন্দেহে তার জীবনের ঐ দিকগুলি তুলে ধরা হয় না যা বাস্তবে তার অভ্যন্তরীণ চিত্র। ইহা তুলে ধরারও কারো অনুমতি নেই। আর না-ই কারো অভ্যন্তরে পৌঁছার শক্তি আছে। "উযকুরু

মাওতাকুম" (তোমরা তোমাদের মৃতদের স্মরণ কর) এ "খায়র" (কল্যাণ, ভালো)-এর প্রতি দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ নেকীর সাথে মৃতদের স্মরণ কর। আমরা ইহারই উপর আমল করবো এবং মন্দকথা তুলে ধরবো না। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই কথাটি নিজের জায়গায় অটল যে "খোদার নিকট মানুষের জীবন-বৃত্তান্ত সত্য।" অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয় ব্যাকুলকারী এক বাক্য। আমাদের মৃত্যুর পর মানুষ আমাদের যতোই প্রশংসা করুক না কেন এবং (প্রশংসা করে) আমাদের যেখানে পৌঁছে দিক না কেন আমাদের জীবনের গোপন কথা-ভয়ানক গোপন কথা যা শুধুমাত্র আমাদের প্রিয় বা নিকটতম ব্যক্তিরা জানে, লেখার অনুমতি থাকলে ওগুলির উপরও যদি কেউ জীবন-বৃত্তান্ত লিখত তাহলে যেন অন্য এক ব্যক্তির চেহারা ফুটে ওঠত, যা অত্যন্ত ভয়ানক। এমন চেহারা ফুটে উঠবে যে, বাহ্যিক জীবন-বৃত্তান্তের (যা সাধারণতঃ লেখা হয়) উপর হৃদয় চিৎকার দিয়ে বলবে, এই জীবন-বৃত্তান্তটি মিথ্যা এবং উহা সত্য। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই জীবন-বৃত্তান্ত ছাপানোর জন্যে বলছেন না বরং বলছেন যে, যে জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তোমরা জ্ঞাত তা খোদার নিকট সত্য। প্রত্যেক মানুষ যদি চায় তাহলে সে তার হৃদয়ে ডুবে এই জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নতুনভাবে পরিচিত হতে পারে। নতুনভাবে এ জন্যে যে, অধিকাংশ সময়ে যখন সে হৃদয়ের গহীনে প্রবেশ করে দেখে তখন সে তার নেকীর কথাই চিন্তা করে। নিজের সুনামের কথাই ভাবে। এই চিন্তা করে যে, অন্যের উপর তার কি ফযিলত (প্রাধান্য) রয়েছে। সুতরাং কুরআন মজীদে যেখানে ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্য)-এর কথার উল্লেখ ছিল সেই ফযিলত অনেক সময় ধোঁকার কারণও হয়ে যায়। আল্লাহ্‌তাআলা তো ফযিলত দান করেছেন। কিন্তু যাকে দান করেছেন সে তার ফযিলতের কথা বলার মধ্যে মগ্ন থাকে এবং নিজের দাগসমূহকে খুঁজে না। যে জীবন-বৃত্তান্ত খোদার নিকট সত্য উহা এমন এক জীবন-বৃত্তান্ত যে পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব। কেননা, সে তো নিজেই ইহা তৈরি করেছে। এই জীবন-বৃত্তান্তের নক্সা তো তার কর্মই প্রস্তুত করেছে। এইরূপে চিন্তা না করলে সত্যিকার তওবা অর্জিত হবে না এবং সত্যিকার ফযিলতও অর্জন করা যাবে না। "এজন্যে হৃদয়কে পুনঃ পুনঃ জাগ্রত করে চিন্তা করা উচিত।" দেখুন কত সুন্দর কথা! ইহা বলা সত্ত্বেও যে, খোদার (তৈরীকৃত) জীবন-বৃত্তান্ত সত্য উহার উপর আমল কর। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জানেন যে, এতদ্‌সত্ত্বেও হৃদয় (মানুষ)-সমূহ ঘুমিয়ে আছে। এই কথা বলতে থাকুন, বার বার বলতে থাকুন, সারা জীবন বলতে থাকুন কিন্তু যে, সকল হৃদয়ের চোখ খুলবে না তা কখনও খুলবে না। তারা অজ্ঞতার ঘুমে ঘুমিয়ে থাকবে। এই কথা তাদের কানের পাশ দিয়ে চলে যাবে ও তারা মনে করবে যে, একথা আমাদের সম্বন্ধে নয় বরং অন্যদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে গোটা জামাত আমার সম্বোধিত। ইল্লা মাশাল্লাহ সবারই একই অবস্থা। আমারও একই অবস্থা ছিল কিন্তু এখন সেই অবস্থার অবসান অনেকাংশে হয়েছে। দিন দিন কম হচ্ছে। কিন্তু অনেক সময় নিজেকে এমন অবস্থায় পাকড়াও করে ফেলি যেখানে আমি মনে করি যে, আমার চিন্তা সঠিক ছিল না। আমার হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া সঠিক ছিল না। আমি মনে করতাম ইহাই ভালো পন্থা। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা দৃষ্টি ফিরিয়েছেন যে, ইহা ভালো পন্থা নয়। সংশোধনের এই শৃঙ্খল সারা জীবনের জন্যে। **এ জন্যে আমি যেভাবে স্বীকারোক্তি করছি তা আপনারা লোকদের সামনে করেন না; তবে নিজের সামনে তো করুন। নিজ খোদার সামনে তো করুন। ঐ সত্য জীবন-বৃত্তান্তকে সামনে রেখে আরও এক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করুন যে, এই সত্য জীবন-বৃত্তান্তকে জেনেও আল্লাহ্‌তাআলা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি (আল্লাহ্‌) যখনই চাইতেন ধ্বংস করতে পারতেন কিন্তু তাঁর রহমত ও নম্রতা ধ্বংস করার ফয়সালা করার পরিবর্তে অবকাশ দেবার সিদ্ধান্ত দিলেন। সুতরাং এই অবকাশ হতে লাভবান হন এবং জেনে নিন যে, এই অবকাশ সর্বদার অবকাশ নয়।** হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এমন ঘটনা ঘটতে পারে যে, নিয়তির প্রকাশ এমন সময়ে হয়ে যাবে যখন আপনার আশা-আকাঙ্খা বাকী ছিল।" এমন সময়ে আপনার জীবন শেষ হবে যার পর কোন ধরনের সংশোধনের পথ খোলা থাকবে না। তিনি (আঃ) বলেন, "তৌহীদের এক ধরন ইহাও যে, খোদার ভালোবাসার জন্যে আত্মার প্রয়োজনসমূহকেও যেন নিজ হতে দূরীভূত করে নেয় এবং নিজ সত্তাকে তাঁর (আল্লাহ্‌র) মহত্ত্বে বিলীন করে দেয়।" ইহা হলো পূর্বে বর্ণিত সকল ব্যাধির চিকিৎসা। "তৌহীদের এক ধরন ইহাও যে, খোদার ভালোবাসার জন্যে আত্মার প্রয়োজনসমূহকেও যেন নিজ হাত দূরীভূত করে নেয়।" অধিকাংশ লোক তৌহীদের সাথে সম্পর্ক এজন্যে রাখেন যে, তাদের আত্মার উদ্দেশ্যসমূহ তৌহীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়ে পূর্ণ হতে পারে না। আর এতটুকুই সম্পর্ক তাদের (তৌহীদের সাথে) থাকে। এমন কি তাদের আখেরাতের দিকে ফিরে যাবার সময় হয়ে যায়। কিন্তু খোদার নিষ্ঠাবান ও পবিত্র বান্দা বিশেষ করে নবীগণ তৌহীদের ঐ ধরনের সাথে সম্পর্ক রাখেন যা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "খোদাতাআলার ভালোবাসার জন্যে আত্মার প্রয়োজনসমূহকেও নিজ হতে দূরীভূত করে নেয়। এবং নিজ সত্তাকে তাঁর মহত্ত্বে বিলীন করে দেয়।" ইহা এমন এক সম্পর্ক যা সকল ধরনের সংশোধনের শক্তি রাখে। যে ব্যক্তি তৌহীদ (প্রতিষ্ঠা করার জন্যে) নিজ আত্মার প্রয়োজনসমূহকে দুরে ফেলে দেয় ইহার অর্থ হলো তার নিকট তৌহীদের পথে সংঘাত সৃষ্টিকারী উদ্দেশ্যসমূহের কোন মূল্য নেই। এইরূপ হলে গোটা জীবনই তৌহীদানুযায়ী হয়ে যাবে। পূর্বে বর্ণিত ব্যাধিসমূহের এর চাইতে উত্তম চিকিৎসা আর হতেই পারে না।

"তৌহীদের জন্যে নিজের মধ্য হতে আত্মার উদ্দেশ্যসমূহকে যেন দূর করে নেয়। আল্লাহ্‌তাআলার কাছে যেন তৌহীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দোয়া করে এবং নিজ আত্মার জাগতিক উদ্দেশ্যসমূহ যেন তলব না করে। আল্লাহ্‌তাআলার তৌহীদ তার প্রয়োজনাদির উপর দৃষ্টি রাখবে এবং তিনি যা কিছু দান করবেন উহাই আমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে।" যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়া আমি আপনাদিগকে বহুবার স্মরণ করিয়েছি– "রব্বি ইন্নি লেমা আনযালতা ইলাইয়া মিন খায়রিন ফাকীর"। তিনি (আঃ) ইহা বলেননি যে, আমার এই প্রয়োজন আমার ঐ প্রয়োজন। উদ্দেশ্য (বা প্রয়োজন) তো এই দোয়াতে নিহিত রয়েছে। তিনি বলেছেন, "তুমি (হে খোদা) যা পসন্দ কর ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দাও।" এই দোয়া দ্বারা দেখুন আপনারা সব কিছু অর্জন করে নিলেন। দুনিয়াও অর্জন করে নিলেন এবং আখেরাতও অর্জন করে নিলেন। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এই বাক্যে ইহা বর্ণনা করছেন যে, আল্লাহ্‌তাআলার জন্যে নিজ আত্মার প্রয়োজনাদি দূর করে দাও। এগুলিকে তুলে এক পাশে ফেলে দাও। তবেই শুধু তৌহীদের ভালোবাসাই তোমার মধ্যে

বাকী থেকে যাবে। আর যখন তৌহীদের জন্যে নিজের উদ্দেশ্যসমূহকে একপাশে তুলে রাখবেন তখন আল্লাহ্‌তাআলা আপনার প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে পর্যবেক্ষক হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ অবশ্যই আপনার সাহায্য করবেন। "কুল্লান নুমিদ্দু হাউলায়ে ওয়া হাউলায়ে" আয়াতের মধ্যে এই অর্থও নিহিত রয়েছে। খোদাতাআলার তরফ হতে ফযলপ্রাপ্ত প্রত্যেক দলের সাথে আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য করার এক অঙ্গীকার রয়েছে। তিনি তাকে সাহায্য করবেন যে, খোদাতাআলার সাহায্য ছাড়া অন্য কোন সাহায্যকারীকে অন্বেষণ করে না। ইহাও তৌহীদের এক ধরন, সুতরাং অনেক দোয়াকারী নিজ দোয়ার বিষয়-বস্তু হতে গাফেল থাকেন। অর্থাৎ তাদের দোয়ায় যে ফল লাগার কথা সে ফল হয় না এবং তারা বুঝতে পারে না যে, কেন তাদের দোয়ায় ফল লাগছে না। "কুল্লান নুমিদ্দু হাউলায়ে ওয়া হাউলায়ে" এই (আয়াতের) মধ্যে ঐ সকল লোক অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্বন্ধে (আল্লাহ্) বলেছেন যে, তারা আখেরাতের জন্যে চেষ্টা করে। অর্থাৎ জগতকে পাবার ইঙ্গিতও তাদের মনে নেই। **এমন প্রত্যেক লোককেই আল্লাহ্‌তাআলা হেফাযত করে থাকেন এবং তাদের সাহায্য করে থাকেন যারা সাহায্যের অন্যান্য সকল পথকে কর্তন করে।** এই আয়াতে আপনাদের দোয়া কীভাবে গৃহীত হবে উহার দর্শন স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সকল কথা কুরআন মজীদেরই তফসীর। ইহার বহির্ভূত নয়। সুতরাং ঐ আয়াত যা আমরা প্রতিদিন পড়তে থাকি, পড়তে থাকি কিন্তু উহার মুল বক্তব্যকে আমরা উপেক্ষা করে যাই। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বার বার ক্রমাগতভাবে সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। যেমন তিনি বলছেন, "হৃদয়কে বার বার জাগ্রত করে চিন্তা করা প্রয়োজন।" এই বিষয়গুলি এমন নয় যে, সহজ-সরল মানুষ ইহা বুঝতে পারবে না। ইহা এমন (বিষয়) নয় যে, ইহাকে বুঝার জন্যে বড় তাত্ত্বিক বা আলেম হবার প্রয়োজন। এই সবগুলি ঐ বিষয় যা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত চালাক বা সহজ-সরল লোকদের সাথে সমভাবে সম্পর্কযুক্ত। এবং সকলেই ইহাকে সমভাবে বুঝতে পারে। যদি এইরূপ না হতো, তাহলে ইসলামের এই শিক্ষা শুধু বাছাইকৃত লোকদের জন্যে হতো জনসাধারণ যারা খোদারই বান্দা তাদের জন্যে এই শিক্ষা প্রযোজ্য হতো না। কিন্তু আমার ধর্ম এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, এই শিক্ষাসমূহ যতই গভীর হোক না কেন, উহাতে নিমগ্ন হবার সুযোগতো অনেক রয়েছে তবে (এই শিক্ষাসমূহ) বাহ্যিকভাবে নিজেই ঐ সংবাদ বহন করছে যা আমাদের মুক্তির জন্যে আবশ্যকীয় এবং আমাদের মুক্তির জন্যে যথেষ্ট। এইজন্যে আমি যে কথাগুলি আপনাদিগকে বলি উহার জন্যে আপনাদের আলেম হওয়া কখনও আবশ্যকীয় নয়। সহজ মানবীয় অভিজ্ঞতার আলোকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মু'মিনদের নসীহত করেছেন।

পরওয়া না করার যে ব্যাপারটি রয়েছে উহার সম্বন্ধেও হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন। আমি শুরুতে যে বিষয়-বস্তুটি বর্ণনা করেছি উহার সম্পর্ক অত্যন্ত সতর্ক হবার সাথে সম্পৃক্ত। এখন বেপরওয়া হবার কথাও শুনে নিন।

"আল্লাহ্‌তাআলা কারও পরওয়া করেন না। কিন্তু সকল বান্দাগণেরই।" এই দু'টি বাক্যের মধ্যে এমন বৈপরীত্য দেখবেন যা উটওয়ালার ঘটনার সাথে যেন স্ববিরোধিতা রয়েছে। "আল্লাহ্‌তাআলা পরওয়া করেন না তবে সকল বান্দাদের।" ঐ বান্দা, ঐ গুনাহ্‌গার যার ঘটনা মরুভূমির সেই উটওয়ালার সাথে সাদৃশ্য করা হয়েছে। সেখানে চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ্‌তাআলা তখন আনন্দিত হন যখন খোদার সেই বান্দা ফিরে আসে, যেভাবে হারানো উট পাবার (উটের) মালিক আনন্দিত হয়ে থাকে। যে হারিয়ে যায় তার জন্যে কোন আনন্দ অনুভূত হয় না। এখন পরওয়া করার বিষয়-বস্তুটি স্বভাবজাত ভালোবাসা ও প্রশান্তির সাথে সম্পৃক্ত। যেন খোদা তার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছেন। অর্থ এই নয় যে, তিনি সকল বান্দার পরওয়া করেন এবং গুনাহ্‌গারদের জন্যে পরওয়া করেন না। তিনি (আল্লাহ্) গুনাহ্‌গারদের পরওয়া এই অর্থে করে থাকেন যে, তারা কোন সময় তো ফিরে আসুক আর কোন সময়ে তো তারা বান্দা হবার চেষ্টা করুক। ইহা সেই বিষয় যা বাহ্যিক বৈপরীত্যকে দূর করে। তিনি (আঃ) বলেন, "যদি তোমরা সবাই তাঁর বান্দা হতে চাও এমন বান্দা যার তিনি অত্যন্ত পরওয়া করবেন তবে পরস্পরের পরওয়া করতে শুরু কর। যদি তোমরা পরস্পরের পরওয়া না কর তবে আল্লাহ তোমাদের কোন পরওয়া করবেন না। **নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার সৃষ্টি কর এবং পশুত্ব ও মতবিরোধ পরিহার কর। তোমরা প্রত্যেক ধরনের হাসি-তামাসা ও বিদ্রূপ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাও।**" ইহার অর্থ এই নয় যে, একে অপরের সাথে আনন্দের জন্যে হালকা ধরনের হাসি-তামাসাও করা যাবে না, কৌতুক করা যাবে না। এই সকল কথা এমন যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা ও জীবন-বৃত্তান্তের সাথে পার্থক্য রাখে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)ও অনেক সময়ে মজলিসে ও ধর্মীয় বিতর্কের সময়ও কৌতুক করতেন। এবং তার লেখার মধ্যেও এমন সূক্ষ্ম রস রয়েছে যা মনকে আনন্দিত করে তোলে। হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ অন্য জিনিস। হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্যে একে অপরকে ছোট করার বিষয়টি নিহিত থাকে। কোন ব্যক্তিকে হেয় মনে করার ফলে, কোন ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট মনে করার ফলে যদি আপনি ঠাট্টা করেন তবে উহা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসি-তামাসার অন্তর্গত হবে। এই ধরনের ঠাট্টা-তামাসা অহংকারের দরুন সৃষ্টি হয়ে থাকে। অহংকার জঘন্য ধরনের গুনাহ্। সুতরাং যখনই আপনি সমাজের অবস্থার সম্বন্ধে চিন্তা করবেন তখনই সেখানে বিভিন্ন ধরনের হাস্যরসিক পাবেন। কিছু এমন হাস্য-রসিক রয়েছেন যারা কথার মধ্যে নিহিত সূক্ষ্মরসে অপরকে অংশীদার করে। এতে গোটা মজলিসে হাসির রোল পড়ে যায়। সেখানে এমন স্থলে কোন এক ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করার চিন্তা-ধারণা থাকে না, সোসাইটির কোন এক ব্যক্তির উপর আক্রমণ করা উদ্দেশ্য নয়। এমন কৌতুককে হাসি-তামাসা বলা যায় না। কিন্তু হাস্য-রসিক এমন পাবেন–এখন চিন্তা করলে আপনারা তাদের চিহ্নিত করতে পারবেন, তারা সর্বদা এমন কথা বলে থাকেন যা আপনাদের কোন ভাইদের লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এবং সে খুব হাসে যে, সে এমন ধরনের মানুষ সে অমন ধরনের মানুষ। তার জন্য মিথ্যা কথাও বলে থাকেন এবং মিথ্যা উদারহণও দিয়ে থাকেন। এবং এই বিষয়ে অত্যন্ত হাস্য-রসিক হিসেবে তারা

বিখ্যাত হয়ে থাকেন। (বলা হয়) সে অমুকের টাক মাথার এভাবে ঠাট্টা করেছে, অমুকের দারিদ্রতার এভাবে ঠাট্টা করেছে। ইহারা ঐ সকল লোক যারা হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রুপকারীদের অন্তর্গত, তাদের অনেকেরই সারা জীবন ঠাট্টা ও বিদ্রুপের মধ্যে সময় অতিবাহিত করে থাকে। **যদি এমন ব্যক্তিবর্গ আমার কথা শুনে থাকেন তবে তারা যখন কৌতুক করে থাকেন তখন তারা যেন উহার সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখেন যে, কৌতুকের কোন অংশটির মধ্যে ইহার মূল রয়েছে। যদি এর মধ্যে নিজের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজ ভাইয়ের অপমান নিহিত থাকে, কিছু হৃদয়ে বর্তমান থাকে কিছু এখানে তো কিছু ওখানে কোথাও অহংকার আছে তো কোথাও নেকির চিহ্ন (তবে ইহা হাসি-বিদ্রুপের অন্তর্গত)।** আমি এ বিষয়টি বিশদভাবে এজন্যে বর্ণনা করছি যদি ঠাট্টার সময়ে আপনি চিন্তা করে দেখেন তবে আপনি জানতে পারবেন যে, এই ঠাট্টার মূল হৃদয়ের কোন স্থানে রয়েছে। সেখানে যদি নেকী ও কল্যাণ হয়ে থাকে এবং উদ্দেশ্য শুধু হাস্য-রস হয়ে থাকে, পরিবেশকে উৎফুল্ল করে তোলার উদ্দেশ্য হয় এবং কারো দুর্নাম করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তবে ইহা কোনভাবে ঠাট্টা-তামাসা ও বিদ্রুপ নয়। এর বিপরীতে কোন অনুমতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোনক্রমেই তার জামাতকে দেন নাই। তিনি (আঃ) বলেন, "ঠাট্টা-বিদ্রুপের মধ্যে মিথার উপাদান নিহিত থাকে। ঠাট্টা-বিদ্রুপের মধ্যে একাংশ মিথ্যা অবশ্যই নিহিত থাকে।" এজন্যে আম্বিয়াদের সাথে (তাঁর) অদলীয় লোকদের ব্যবহারকে কুরআন হাসি-ঠাট্টা বলে অবহিত করেছে। তিনি (আঃ) বলেন, "ঠাট্টা-বিদ্রুপকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর। কেননা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ মানুষকে সত্য হতে দুরে নিয়ে যায়। সত্য হতে দূরে নিয়ে গিয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়।" সুতরাং ঐ হাসি-তামাসা থাকে সামান্য বিষয় বলে মনে করা হয় যদি উহাতে মিথ্যার মিশ্রণ থাকে তবে এই বৃক্ষকে উৎপাটিত করা হবে। "শাযারায়ে খাবীসার" (মন্দবৃক্ষ) ন্যায় পৃথিবীর এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হতে থাকবে। এবং ইহার আয়ু নিঃশেষ হয়ে যাবে।

হাওয়া বা মিথ্যা দ্বারা পরিচালিত এই বৃক্ষের মধ্যে ধীরে ধীরে কোন প্রাণই থাকবে না। এ কথাগুলিকে আপনাদের সকলকে বুঝতে হবে। অবশ্যই বুঝতে হবে এবং অবশ্যই বুঝতে পারবেন। মোটা বুদ্ধির লোকও এ কথাগুলিকে বুঝতে পারে। **যখনই কারো মন কৌতুকের দিকে যায় সে যেন তার অন্তরকে হাতিয়ে দেখে যে, এই হাসি-তামাসা তার হৃদয়ের কোন স্থানের সাথে জড়িত। হৃদয়ের ঐ স্থান যদি পবিত্র ও পরিষ্কার হয় এবং উহাতে মন্দবৃক্ষ জন্মাবার অবকাশ নেই তাহলে আপনি সফল। আপনি তাদের অন্তর্গত যাদের আল্লাহ্তাআলা মহান সফলতা অর্জনকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন, নতুবা আপনাকে উৎপাটিত হতে হবে এবং উৎপাটিত হয়ে অবশেষে মৃত্যুর দিকে আপনার সফর শুরু হয়ে যাবে।** তিনি বলেন, "ঠাট্টা-বিদ্রুপ মানুষকে সত্য হতে দূরে নিয়ে গিয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়।" অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে আমি এমন লোকদের পর্যবেক্ষণ করেছি। ইহা একশ' ভাগ সঠিক কথা। এমন ধরনের হাসি-ঠাট্টায় আক্রান্ত লোক কখনও নিজের নেকির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। এক জায়গা হতে উৎপাটিত হয়ে অন্য জায়গায় চলে যায় যেখানে মৃত্যু তাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। ইহার চিকিৎসা কী? একে অপরের সাথে সম্মানের সাথে ব্যবহার করা। দৈনন্দিন জীবনে সম্মানের যে বিষয়টি রয়েছে তা হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতার সাথে হওয়া উচিত। অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীও সম্মান করে থাকে এবং বলে থাকে যে, দেখ আমি সম্মানের সাথে আচরণ করছি। যেমন কাউকে ছোট দেখে বলে থাকে "আও বাদশাহ্ বেয়ঠো ইথেথ।" (বাদশাহ্ এখানে এসে বসো), বাদশাহ্ বলে বাহ্যিকভাবে সম্মান করে, বাস্তবে এই কথা বলে তাকে শক্ত অপমান করে থাকে। কোন গরীব মানুষকে বলে 'শেঠ সাহেব আসুন।' তারা বলে আমরা তো শেঠই বলেছি কিন্তু আসলে বলে, সে এত গরীব যে, সে শেঠের বিপরীত, বাহ্যিকভাবে 'শেঠ' বলে তার সম্মান করা হয়েছে কিন্তু ইহার চাইতে কষ্টদায়ক ছুরি তার হৃদয়ে আর মারা যায় না। তাকে গরীব বললে সে হয়ত এত কষ্ট পেত না। যদি গরীবকে 'শেঠ' বলা হয় তবে তার গরীব হবার কথা মনে পড়ে যায়। এবং মন্দরূপে তার মনে পড়ে। কষ্টদায়ক হয়। যেহেতু আজ সময় শেষ হয়ে এসেছে তাই এই বিষয়-বস্তুকে আমি এখানে শেষ করছি। এই বিষয়-বস্তুর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ্ চলতে থাকবে, আমার চেষ্টা হবে জামাত যেন হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভাবনানুযায়ী নিজদিগকে গড়ে তোলে। আজকের বড় সুসংবাদ হলো সুইডেনের জামাত এক বড় প্রয়াস চালিয়েছে। তারা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভাবনানুযায়ী নিজদিগকে গড়ে তোলে। আমার দোয়া তারা যেন সর্বদার জন্যে এ বিষয়ে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে যায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত যেন এই নেকীকে হাতছাড়া না করে, যে নেকি অবলম্বন করার আজ তারা প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমার প্রতিনিধির বর্তমানে যে মজলিসে আমেলা সেখানে নির্বাচিত হবে সেখানে এই প্রতিজ্ঞা আবার করা হবে।

(ধারণকৃত ক্যাসেটে থেকে শ্রুত ও অনূদিত)

অনুবাদ-মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

আনসারুল্লাহ্'র তাজনীদ রিপোর্ট

মজলিসে আনসারুল্লাহ্'র সকল স্থানীয় মজলিসের যয়ীমে আলা/যয়ীমগণের নিকট বিনীত অনুরোধ এই যে, আপনার নিজ নিজ মজলিসের তাজনীদ রিপোর্ট যথাশীঘ্র কেন্দ্রে প্রেরণ করুন। ইতোমধ্যে বছরের চারমাস গত হতে চলেছে। পরিপূর্ণ তাজনীদ রিপোর্ট না থাকায় সঠিক কর্মসূচী প্রণয়ন সম্ভব হচ্ছে না। তাই ভ্রাতাগণের নিকট অনুরোধ, তাজনীদ রিপোর্ট প্রেরণের ব্যাপারে যত্নবান হোন।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত খোদ্দাম আনসারুল্লাহ্'য় পদার্পণ করেছেন কিন্তু নিবন্ধিত হন নি, তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে তাজনীদভুক্ত করে সত্বর রিপোর্ট পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সালাহ্ উদ্দিন আহমদ
কায়েদ তাজনীদ
মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

আপত্তির উত্তর

ঢাকা হতে প্রকাশিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আরাফাত'-এর ৮, ১৫, ২২ ও ২৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং সংখ্যাসমূহে জনাব মোঃ আলতাফ আলী বি, এ, বি, এড ধারাবাহিকভাবে "কাদিয়ানী নবুওতের স্বরূপ উদঘাটন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। জনাব আলতাফ আলী তার প্রবন্ধে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উথাপন করেছেন। এ সকল আপত্তি আমাদের বিরুদ্ধে নতুন কিছু নয়। বিগত ১০৯ বৎসর থেকেই এ জাতীয় আপত্তির সাথে জনগণও পরিচিত। বার বার এসব আপত্তির উত্তর দেয়াও হয়েছে। জনাব আলতাফ আলী সাহেবের আপত্তির উত্তর দেয়াও আমরা সমীচীন মনে করি। কারণ সত্যের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার হীন প্রচেষ্টা রুখে দেয়া আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।

জনাব আলতাফ আলী সাহেবের আপত্তির উত্তর দেবার পূর্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন, খতমে নবুওয়ত সংক্রান্ত আহমদীয়া ধর্ম-বিশ্বাসকে আক্রমণ করে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'তর্জুমানুল হাদীস'-এ ১৯৫২ সালের ১লা মে তারিখে "নবুওয়তের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধের লেখক ছিলেন জনাব আল্ মোহাম্মদী সাহেব। এ প্রবন্ধে তিনি এমন কোন দলিল উপস্থিত করেননি, ইতোপূর্বে আহমদীয়া সাহিত্যে যার উত্তর দেয়া হয়নি। ১৯৫২ সালের অক্টোবরে তৎকালীন আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে আল্ মোহাম্মদী সাহেবের আপত্তির উত্তরে 'খাতামান নবীঈন' শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আজো এ পুস্তকের কোন প্রতি-উত্তর আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি। যাহোক এখন আমি জনাব আলতাফ আলী সাহেবের প্রবন্ধের জবাব দিবার পূর্বে তাঁকে উক্ত পুস্তকখানা পাঠ করতে সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি বা তাঁর সম্প্রদায় যদি উক্ত পুস্তক খানার জবাব লিখে সাধারণ্যে প্রকাশ করতেন তাহলে তাঁকে এ ধরনের প্রবন্ধ লেখার জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে হতো না।

জনাব আলতাফ আলীর দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি মূলত: ৬টি আপত্তি উথাপন করেছেন। আপত্তিসমূহের ধারাবাহিক উত্তর নিম্নে দেয়া হলো।

প্রথম আপত্তি : মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী খৃষ্টান ইংরেজ শাসকদের ধর্মীয় দালাল হিসাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইমাম মাহদী ও নবী হওয়ার দাবী করে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে মর্দে মুজাহিদ ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী, সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী ও কবি ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল তাদের বক্তৃতা, বিবৃতি ও যুক্তিজ্ঞানের শাণিত অস্ত্র দ্বারা এ ফিতনার মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন।

উত্তর : এ উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকেই খৃষ্টান পাদরীরা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের উপর মিথ্যা ও কল্পিত অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে অগণিত পুস্তক ও প্রচারপত্র ছড়িয়ে দিচ্ছিল। পাদরীগণ বাজারে-বন্দরে, অলিতে-গলিতে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে উপমহাদেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এসব পাদরীর ধূর্ততার শিকার হয়ে এ উপমহাদেশে প্রায় ১৩ লক্ষ মুসলমান মুর্তাদ হয়ে ত্রিত্ববাদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট আলেম ও আহলে রসূল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মুসলমানদেরকে এ দুর্বিসহ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) নিজেকে নিয়োগ করলেন। তাঁর সাধনার যুগান্তকারী রূপায়ণ হচ্ছে 'বরাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ প্রণয়ন। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্ন করেন এবং খৃষ্টান পাদরীদের ইসলাম বিরোধী মিথ্যা প্রচার অকাট্য দলিল-প্রমাণের সাহয্যে খণ্ডন করেন।

জনাব আলতাফ আলী যে কয়েকজন মর্দে মুজাহিদ ইসলামী চিন্তাবিদের উল্লেখ করেছেন তাদের অন্যতম মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী 'বরাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের প্রশংসায় বলেন: "আমার মতে এই কেতাব এ যুগে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি কেতাব যার তুল্য কোন পুস্তক আজ পর্যন্ত ইসলামে রচিত হয়নি এবং ভবিষ্যতের কথা জানা নেই। ইহার প্রণেতা ইসলামের সাহায্যে ধন ও প্রাণ, লেখা ও কার্য এবং আদর্শ ও আলোচনা দ্বারা এরূপ একনিষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছেন যে, তাঁর তুলনা পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্যে একান্তই বিরল।"

(ইশআতুস্ সুন্নাহ্ –সপ্তম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠা)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) তাঁর ৮০/৯০ খানা গ্রন্থের সব কয়টিতে খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। তিনি খৃষ্টানদের খোদার পুত্র তথাকথিত খোদাবন্দ খোদা ঈসা ইব্নে মরিয়মকে মৃত প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর কবর রয়েছে কাশ্মীরে। খৃষ্টান ইংরেজ শাসকরা কি এতই আহাম্মক ছিল যে, তারা এমন ব্যক্তিকে তাদের ধর্মীয় দালাল নিয়োজিত করলো যিনি তাদের খোদাকেই মৃত সাব্যস্ত করলেন? বরং খৃষ্টান ইংরেজ শাসকদের দালালতো ঐ সকল আলেম-ওলামা যারা আজো হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন বলে বিশ্বাস করে। কেননা, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী। এরাইতো সেই সকল আলেম যারা খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে আরো জোরদার করছেন। জনাব আলতাফ আলী সাহেবের জন্য আফসোস ও দোয়া করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করণীয় নাই।

এবার জনাব আলতাফ আলী সাহেব কর্তৃত উল্লেখিত মর্দে মুজাহিদ ইসলামী চিন্তাবিদগণ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। এর পূর্বে বলা প্রয়োজন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) অবশ্য এ উপমহাদেশে ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা করেছিলেন। এ প্রশংসার আসল কারণ জানতে হলে ঐ যুগের অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। ঐ যুগ ছিল এমন যুগ যখন মুসলমানেরা শিখদের দ্বারা জীবনের সকল অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছিল। শিখ শাসকরা মুসলমানদের জন্য আযান দেয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা এ

দেশে এসে ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নিয়েছিলো। তাই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি কোন খোশামোদের উদ্দেশ্যে ইংরেজদের প্রশংসা করতেন না। বরং ইহা ছিল ইসলামী শিক্ষানুযায়ী উপকারীর উপকার স্বীকার করার দায়িত্ব পালন। তাই তিনি (আঃ) বলেন :

"অতএব, হে নির্বোধেরা! শুন, আমি এ সরকারের কোন খোশামোদ করি না। বরং আসল কথা এই যে, এরূপ সরকার, যারা দীন-ইসলাম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোন হস্তক্ষেপ করে না এবং নিজেদের ধর্মের উন্নতির জন্যও আমাদের উপর তলোয়ার চালায় না, কুরআন শরীফের আলোকে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করা হারাম। কেননা, তারাও কোন ধর্মীয় যুদ্ধ (জেহাদ) করে না।'

(কিশ্‌তিয়ে নূহের টীকা, পৃষ্ঠা- ৬৮)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তো ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা করেছিলেন ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী। কিন্তু এখন শুনুন তথাকথিত মর্দে মুজাহিদগণ ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা ও খোশামোদ-তোশামোদ করতে গিয়ে কোন্ পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে কবি ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল একটি শোকগাঁথা লিখেছিলেন। এতে তিনি যা বলেন তার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

"সম্রাজ্ঞীর লাশ ওঠেছে। সম্মান দেখানোর জন্য যে পথে লাশ যাবে সে পথের ধূলা হয়ে ইকবাল তুমি পড়ে থাক। অবস্থা তো তাই। নামে কি আসে যায়? আমি তোমাকে মুহাররাম মাসের নাম দিচ্ছি।"

কবি ইকবাল আরো বলেন :

"হে ভারতবর্ষ, তোমার মাথার উপর হতে খোদার ছায়া উঠে গেছে। তিনি তোমার অধিবাসীদের এক দরদী ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া) চলে গেলেন। তাঁর জন্য খোদার আরশ টলে যায়। কান্নাতো এর জন্যই। ভারতের সৌন্দর্য যাঁর মধ্যে ছিল এ তো তাঁর মৃতদেহ।"

ইনিই হচ্ছেন মর্দে মোজাহিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল, যিনি আহমদীয়তের বিরুদ্ধাচরণে শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য ছিলেন। সুধী পাঠকগণ! এখন বিচার করুন কে ইংরেজ শাসকদের দালাল ছিল?

ইংরেজ শাসন সম্পর্কে এখন আহলে হাদীস নেতা মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেবের অভিমত শুনুন। তিনি লেখেন :

"রোমের সুলতান একজন ইসলামী বাদশাহ। কিন্তু সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সুশাসনের দিক থেকে (ধর্মকে বাদ দিয়ে) বৃটিশ সরকারও আমাদের স্বজাতি মুসলমানদের জন্য কোন কম গৌরবের কারণ নয় এবং বিশেষভাবে আহলে-হাদীস সম্প্রদায়ের জন্য তো এ ধরনের শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার দিক হতে বর্তমান সময়ে সমগ্র ইসলামী সুলতানদের (রোম, ইরান, খোরাসান) চেয়েও অধিক গর্বের কারণ।"

(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ্ পত্রিকা, ১০ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা. ২৯২-২৯৩)

তিনি আরো বলেন :

"এ শান্তি ও স্বাধীনতার এবং সুশাসনের দিক হতে ভারতবর্ষের আহলে-হাদীস সম্প্রদায় বৃটিশ গভর্নমেন্টকে আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হতে 'গনীমত' মনে করে এবং এ সরকারের প্রজা হওয়াকে ইসলামী সুলতানদের প্রজা হওয়ার চেয়ে উত্তম মনে করে।"

(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ্ পত্রিকা, ১০ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা. ২৯২-২৯৩)

প্রকৃতপক্ষেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইংরেজদের প্রশংসা করেছেন এবং একাধিকবার করেছেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেক জায়গায় এ কথা বলেছেন যে, আমি এ জন্য ইংরেজদের প্রশংসা করি যে, ভারতের মুসলমানদের বিশেষভাবে পাঞ্জাবের মুসলমানদের দুরবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের কোন অধিকারই আর অবশিষ্ট ছিল না। শিখ শাসকেরা এরূপ যুলুম-নির্যাতন করেছিল যে, এর কোন দৃষ্টান্ত অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। ইংরেজ শাসকগণ এসে এ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হতে মুসলমানদের বের করলেন এবং তাদের সকল অধিকার বহাল করলেন। এ কারণেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করতে বাধ্য হন। কেননা, এটা কেবলমাত্র নবীগণের সুন্নতই নয় বরং সাধারণ মানবিক সৌজন্যেরই তাকিদ যে দয়াকে দয়ার সাথে স্মরণ করতে হয়। একে কি দালালী বলা যেতে পারে?

দ্বিতীয় আপত্তি : জনাব মোঃ আলতাফ আলীর দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে, "কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ এবং আল্লামা ইকবাল ও মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী-এই তিনজনেই ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। কাজেই আল্লামা ইকবাল ও মাওলানা অমৃতসরী দু'জনেই মির্যা গোলাম আহমদকে অনেক নিকট থেকেই চিনতেন। এ কারণে উভয়েই কাদিয়ানী নবুওয়তের ফিতনার বিরুদ্ধে ভীষণ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।"

উত্তর : একে যদি চেনা বলে তবে আবূ জাহল ও আবূ লাহাব খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে আরো অতি নিকট থেকে চিনতো। কেননা, তারা ছিল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচা। এরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে যত দুশমনী করেছিল তত দুশমনী তৎকালীন মক্কার আর কেউ করেনি। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল অন্ধ-জন্মান্ধ। পবিত্র হৃদয় ছাড়া কেউ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষকে চিনতে পারে না। তাই আবূ জাহল ও আবূ লাহাবও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে চিনতে পারেনি। তাঁকে (সাঃ) চিনতে পেরেছিল জাগতিক দৃষ্টিতে অতি নগণ্য ক্রীতদাস হযরত বেলাল ও হযরত যায়েদ। তাঁকে (সাঃ) চিনতে পেরেছিলেন অন্যান্য পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ। হযরত মির্যা সাহেবকেও ঐ সময়ের বিশিষ্ট আলেম বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ চিনতে পেরেছিলেন যেমন, হাজীউল হারমাঈন শরীফাঈন হযরত হেকিম নূরুদ্দীন, মাওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি মাওলানা মুহাম্মদ আলী, এম. এ. এল. এল. বি. খাজা কামাল উদ্দীন এবং এ রকম আরও অনেকে।

অনুরূপভাবে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল তৎকালীন ইহুদী আলেমরা। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-কে চিনতে পেরেছিল অতি দীন-দরিদ্র ককেজন হাওয়ারী (অর্থাৎ জেলে)। হযরত নূহ (আঃ)-কে তাঁর নিজের ছেলেই চিনতে পারেনি। হযরত লূত (আঃ)-কে তাঁর নিজের স্ত্রী-ই চিনতে পারেনি। উদাহরণের সংখ্যা আর বাড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নবীগণের ইতিহাস এমনিই। এ যুগেও যদি আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হয়েও মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে কবি ইকবাল ও মাওলানা অমৃতসরী বা মাওলানা মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী চিনতে

না পারেন তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আলেমরা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরোধিতা করবেন – একথাও তো বলা আছে।

তৃতীয় আপত্তি : "মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে মির্যা গোলাম আহমদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কল্পে দণ্ডায়মান হলেন। এমনকি উভয়পক্ষে মুবাহালা হবে হবে করে হয়নি। মির্যা গোলাম আহমদ সাহস পায়নি।"

উত্তর : জনাব মোহাম্মদ আলতাফ আলী বলতে চেয়েছেন মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী ও হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মধ্যে মুবাহালা হবে হবে করেও হয়নি। কারণ মির্যা সাহেব সাহস পাননি। হযরত মির্যা সাহেব সাহস পাননি–এটা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা অভিযোগ। এটা বানোয়াট। এর উত্তর একটাই। তা হলো–মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী। তিনি আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ। আলাহ্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ আল্লাহ্র সিংহ হয়ে থাকেন। তাঁরা কখনো জগতের মানুষকে ভয় পান না, এরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন। হযরত মসীহ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তৎকালীন ভারতবর্ষের বহু প্রখ্যাত আলেমদের সাথে মুবাহালা করেছিলেন। প্রত্যেকটি মুবাহালায় আল্লাহ্ তাঁকেই জয়যুক্ত করেছিলেন।

এমনকি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বর্তমান বিশ্বের বহু বড় বড় আলেমকে মুবাহালায় চ্যালেঞ্জ করেছেন। জনাব আলতাফ আলী সাহেবের অবগতির জন্য জানাচ্ছি বাংলাদেশেও হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে আমাদের বর্তমান ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব ৪/১২/৯৭ তারিখে বায়তুল মোকররম মসজিদের ইমাম মাওলানা ওবায়দুল হক ও তার সঙ্গীদের মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। খতীব সাহেব তা গ্রহণ করেছেন বলে পত্রিকায় প্রকাশ। ইনশাল্লাহ্, এ মুবাহালায় আল্লাহ্তাআলা আহমদী জামাতকে জয়যুক্ত করবেন।

চতুর্থ আপত্তি ঃ জনাব আলতাফ আলী তার প্রবন্ধে বলেন, আল্লামা মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী তার "নবুয়াতে মুহাম্মদী" গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ের চরমত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ তিনিই শেষ নবী তাঁর পর আর কোন নবী নেই- এ বিষয়ে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী সাহেব সূরা আল্ আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াত (বিসমিল্লাহ্ সহ গণনা করলে ৪১ নম্বর হয়) তুলে ধরে নবীর দাবীদারগণের (তিনি আহমদীদেরকে বুঝিয়েছেন) বিভ্রান্তির কুহেলিকার আবরণ অপসারণ করেছেন।

উত্তর ঃ ঘুরে ফিরে আহমদীদের বিরুদ্ধে ঐ একই পুরাতন আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতের 'খাতামান্নাবীঈন' এর অর্থ এরা করেছেন 'শেষনবী'। কিন্তু খাতামান্নবীগণের অর্থ কখনো শেষ নবী নয়। এর অর্থ 'নবীগণের মোহর'। খোদ সৌদী আরব হতে কুরআনের যে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতেও এর অর্থ করা হয়েছে Seal of the Prophets অর্থাৎ নবীগণের মোহর।

মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ শফী সাহেব কর্তৃক রচিত 'খতমে নবুওয়াত' বইটির বঙ্গানুবাদ করেছেন জনাব মুহাম্মদ সিরাজুল হক। অনূদিত উক্ত গ্রন্থটির ৬৮ পৃষ্ঠায় 'খাতাম' শব্দটির যে সকল অর্থ করা হয়েছে তা পড়ে দেখতে সুধী পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এতে, খাতাম শব্দের অর্থ করা হয়েছে (১) নাগীনা মোহর, (২) আংটি (৩) সর্বশেষ জাতি, (৪) ঘোড়ার পায়ের সাদা চিহ্ন। তবে এতে 'খাতেম' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'কোন কিছু সমাপ্তকারী'। উল্লেখ্য, সূরা আহযাবের উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্তাআলা 'খাতামান্নাবীঈন' বলেছেন। এর পঠনরীতিতে কোন রকম পরিবর্তন করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও শেষ শরীয়তদাতা নবী। কেননা, কুরআন শেষ ও স্থায়ী শরীয়ত। অধিকন্তু আহমদীরা বিশ্বাস করে যে, ইসলামে উম্মতি নবী আগমনের পথ খোলা আছে। এ ব্যাপারে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) 'খতমে নবুয়ত'এর ব্যাখায় বলেন ঃ

"মুহাম্মদী নবুওয়তের মধ্যে সকল নবুওয়ত শেষ হইয়াছে। ইহাও হওয়ার কারণ ছিল। কারণ যাহার আদি আছে, তাহার অন্তও আছে, কিন্তু এই মুহাম্মদী নবুওয়ত স্বীয় আশীষ বিতরণে অসমর্থ নয়। বরং সকল নবুওয়ত অপেক্ষা ইহাতে অধিক ফয়েয বা, আশীষ আছে। এই নবুওয়তের অনুসরণ অতি সহজে খোদা পর্যন্ত উপনীত করে। ইহার অনুবর্তিতায় খোদাতাআলার প্রেম ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপস্বরূপ মহাকল্যাণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহার পূর্ণ অনুবর্তিতাকারী কেবল নবী নামে অভিহিত হইতে পারে না। কারণ ইহাতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মুহাম্মদী নবুয়তের অবমাননা হয়। অবশ্য 'উম্মতি' ও 'নবী' এই উভয় শব্দ সম্মিলিতভাবে তৎপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ ইহাতে সর্বাঙ্গীন মুহাম্মদী নবুওয়তের অবমাননা হয় না। বরং সেই নবুওয়তের জ্যোতিঃ এই আশীষ বিতরণ দ্বারা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়" (আল্ ওসীয়্যত পৃষ্ঠা ১৬)।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহুতালাআনহা) ধর্মের অর্ধাংশের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি বলেনঃ

"তোমরা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে 'খাতামুল আম্বিয়া' (নবীগণের খাতাম) বলিবে; তাঁহার পর কোন নবী নাই- একথা বলিও না" তোক্‌মেলা মাজমাউল বেহার, পৃষ্ঠা ৮৫; তফসীর আল্ দুররুল মানসূর, ৫ম খণ্ড ,পৃষ্ঠা ২০৪)।

'খাতামান্নাবীঈন'এর অর্থ যে শেষ নবী নয় তার আরো একটি দলিল পেশ করছি। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব 'নশরুত্ তীব ফি যিকরিন্নাবিয়্যীনা হাবীব (সাঃ)' শীর্ষক রসূলে পাক (সাঃ)-এর একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির বাংলা তরজমা করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম সাহেব। বাংলায় অনূদিত গ্রন্থটিতে উদ্ধৃত একটি সুদীর্ঘ হাদীসের প্রতি (গ্রন্থের ২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আমি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্তাআলা বলেন, "আমার ইসমত ও গৌরবের শপথ আমার সমস্ত মখলুকের জন্য জান্নাত হারাম, যতক্ষণ মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে। অতঃপর মূসা (আঃ) আরয করলেনঃ হে আল্লাহ্ আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেনঃ **সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে।**

অতএব এ কথা বলা ঠিক নয় যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর পরে কোন নবী আসবেন না। তবে হাঁ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী আসবেন না। শরীয়তদাতা নবী আসবেন না, কেবল উম্মতী

নবীর দরজাই খোলা আছে। ইসলামের অতীতের বুযুর্গানেরা খতমে নবুওয়তের এ ব্যাখ্যাই দিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে যদি কেউ আরো তথ্য জানতে চান তবে তাকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর ঢাকাস্থ ৪ নং বকশী বাজারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পঞ্চম আপত্তি ঃ জনাব আলতাফ আলী সাহেব তার সুদীর্ঘ প্রবন্ধের এক জায়গায় লেখেন, পাকিস্তানে পূর্ববর্তী লেখকদের মসী-যুদ্ধের প্রভাবে ভুট্টো সরকার কাদিয়ানীদেরকে 'নটমুসলিম' ঘোষণা প্রদানে বাধ্য হয়েছিল। তাই আলতাফ আলী সাহেব অনুরোধ জানাচ্ছেন, বাংলাদেশে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার ভীষণ কঠোর আন্দোলনের প্রাক্কালে মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী কর্তৃক রচিত শাণিত অস্ত্রতুল্য 'নবুওয়াতে মোহাম্মদী' গ্রন্থখানা আন্দোলনের কর্মীদের প্রত্যেকের হস্তে তুলে দেয়া হউক।

উত্তর ঃ জনাব আলতাফ আলী সাহেব, যদি আপনি মনে করেন ভুট্টো সাহেব পাকিস্তানে আহমদীদেরকে 'নটমুসলিম' ঘোষণা দিয়ে ইসলামের বড় খেদমত করে গেছেন, তবে পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হক সাহেব যখন তাকে খুনের অভিযোগে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলালেন তখন আপনি ও আপনার সমগোত্রীয়রা কেন রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল বের করলেন না ও কেন ইসলামের এত বড় খেদমতগুযারের অন্যায় হত্যার বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদে ফেটে পরলেন না? যখন আরবের বাদশাহ ভুট্টো সাহেবের প্রাণভিক্ষা চেয়ে জিয়াউল হক সাহেবকে অনুরোধ জানালেন তখন তিনি বললেন, "এই বেজান্মাকে আমি হত্যা করবো।" পক্ষান্তরে জিয়াউল হক সাহেবও পাকিস্তানে আহমদীদের উপর অমানবিক যুলুম-অত্যাচার করেছিল। এগার বৎসর ধরে তিনি পাকিস্তানে ইসলামীকরণ করে 'হিরো' হতে চেয়েছিলেন। ভুট্টো সাহেবের ন্যায় তারও অপমৃত্যু হলো। ফেরাউন পানিতে ডুবে মরেছিল। অন্যদিকে জিয়াউল হক আকাশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যে, তার দেহের কোন অংশই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার দাঁত এনে ইসলামাবাদে কবর দেয়া হয়। অবশ্য অনেকেই সন্দেহ করেন যে, এটা জিয়াযুল হকের দাঁত নাকি অন্য কারও!

ইসলামের এ দুই তথাকথিত খেদমতগারের কেন এ করুণ পরিণতি হলো? কেন ফেরাউন, আবূ লাহাব, আবূ জাহলের মত অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করতে হলো এ দুই মহানায়ককে? বিবেকবান ব্যক্তিগণের নিকট প্রশ্ন রেখে এ উত্তরের এখানেই ইতি টানছি। উল্লেখ্য বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা জিয়াউল হককে মুবাহালার চ্যালেঞ্জে দিয়ে বলেছিলেন "দুনিয়ার কোন শক্তি তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না"। এর অল্পদিন পরই অপঘাত মৃত্যুতে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

ষষ্ঠ আপত্তি ঃ জনাব আলতাফ আলী সাহেব লেখেন, 'হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের সংবাদ বিশুদ্ধ হইলেও খতমে নবুওতের হাদীসের ন্যায় অকাট্য ও পৌনঃপুনিক নয়। হযরত ঈসার (আঃ) অবতরণ সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ ঘটতে পারে এবং ঘটেছে। সুতরাং উসুলে হাদীসের নিয়ম অনুসারে ঈসার হাদীসকে খতমে নবুওয়তের হাদীসের সমকক্ষ কোনক্রমেই স্বীকার করা যেতে পারে না।"

উত্তর ঃ জনাব আলতাফ আলীর উপরোক্ত আপত্তিটির মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বিরোধিতা। একদিকে তিনি বলছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের সংবাদ বিশুদ্ধ। অন্যদিকে বলছেন, ইহা খতমে নবুওয়তের হাদীসের ন্যায় অকাট্য ও পৌনঃপুনিক নয়। আবার বলছেন, ঈসার অবতরণ সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ ঘটতে পারে এবং ঘটেছে।

জনাব আলতাফ আলীর এতসব পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের কারণ কি? কারণ তিনি ব্যাখ্যা করতে না পারলেও আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আমরা অর্থাৎ আহমদী জামাতের সদস্যরা ব্যাখ্যা করতে পারি। স্ববিরোধিতার কারণটি হচ্ছে এই যে, একদিকে ঈসা ইবনে মরিয়মের অবতণের সংবাদ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ তিরমিযী প্রভৃতি সসীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। অন্যদিকে আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন, 'হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের নবী তাদের মধ্য হতেই হবে।' অর্থাৎ বনী ঈসরাইলী নবী হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন না। প্রকৃতপক্ষে উভয় হাদীসই সত্য। কিন্তু এ যুগের আলেমগণ হাদীসের ব্যাখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। আল্লাহতাআলার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলছেন, বনী ঈসরাইলী নবী হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে কাশ্মীরে। তিনি আকাশে সশরীরে জীবিত নেই। কাজেই আকাশ থেকে তাঁর অবতরণের প্রশ্নই উঠে না। তাহলে ঈসা ইবনে মরিয়ন যিনি নবীউল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র নবী হবে তার অবতরণের ব্যাপারে সহীহ হাদীস মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে তার তাৎপর্য কী? হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলছেন, আমিই সেই প্রতিশ্রুত ঈসা, তার দৈহিক অর্থে নয় রূপক অর্থে। আমি ঈসা ইবনে মরিয়মের গুণে গুনান্বিত উম্মতী নবী হয়ে এসেছি। এখানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে আমাদের জামাতের প্রচুর বই রয়েছে তা পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

এ বিষয়ে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উম্মতের হেদায়াতের জন্য বনী ইসরাঈল জাতির বা অন্য কোন জাতির কোন নবীর পৃথিবীতে আগমনের যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি তা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্যে অন্য কোন জাতি হতে নবীর আগমনের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ গোলামী ও অনুবর্তিতার মাধ্যমে এবং 'মুহাম্মদী প্রদীপ' হতে আলোকিত ও কল্যাণমণ্ডিত হয়ে তাঁরই (সাঃ) উম্মত হতে নবী হবেন। তাইতো হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেনঃ

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁরই হইয়া গিয়াছি। যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই। খোদার পরেই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর। ইহা যদি কুফরী হয়, খোদার কসম, আমি শক্ত কাফের। সত্যের ভয়ে তাঁহাকে (মুহাম্মদ-সাঃ)-কে খোদা বলি না। কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা দর্শণের দর্পনস্বরূপ" সারকথা এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুবর্তিতার ও গোলামী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) উম্মতী নবীর মকাম ও মর্যাদা লাভ করেছেন।

নাজির আহমদ ভুঁইয়া

কুরআনী জিন্দেগী
(ষষ্ঠ কিস্তি)

৭। বিশ্ব জগতের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ্ তিনি সকল কার্যের কারণীক। তিনি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

কুরআন

২৪। নিশ্চয় সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেয়ার সত্তাধিকার তাঁরই, আল্লাহ্ অতীব বরকতময়, সমগ্র জগতের প্রতিপালক (৭:৫৫)'ক'*।

২৫। তিনি প্রত্যেক বিষয় পরিচালনা করেন (এবং) তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ (১৩:৩)'খ'।

২৬। এবং এই যে, নিশ্চয় (সকল বিষয়ের) পরিসমাপ্তি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘটে (৫৩:৪৩) 'গ' **।

২৭। শুন! তারা নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহে নিপতিত; আবার শুন! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন (৪১:৫৫)'ঘ'।

'ক' ১৮:২৭; ১৩:৪২; ৪০:১৩; ৫৪:৫১; ৬৪:১২; ৬৫:১৩;
'খ' ২:২৫৬; ১০:৪, ৩২; ৬;
'গ' ৪:১৩৩; ৩১:২৩; ৪২:৫৪; ৫৩:৪৪-৪৯; ৯২:১৪;
'ঘ' ২:২০; ৩:১২১; ৪:১০৯; ১২৭; ৬:৮১; ১১:৯৩; ১৭:৬১; ১৮:৯৫;

** 'খাল্ক' (সৃষ্টি) এবং আমর (আদেশ বা হুকুম) এই দু'এর মধ্যে পার্থক্য হল, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা সাধারণত: পূর্ব হতেই অস্তিত্ববান রয়েছে এমন বস্তু বা পদার্থকে প্রকাশ বা ব্যক্ত করা অথবা পরিমিত করা ও কার্য প্রণালীভূক্ত করা বুঝায়, এবং শেষোক্ত শব্দ দ্বারা অস্তিত্বহীন অবস্থা হতে কোন কিছুর সত্তা শুধু 'হও' আদেশের বলে সৃজন করা বুঝায়। "সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেয়ার সত্তাধিকার তাঁরই।" এই বাক্যাংশের অর্থ এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ্ কেবল এই বিশ্বই সৃষ্টি করেন নি, পরন্ত তিনি এর উপর কর্তৃত্ব এবং হুকুমও প্রয়োগ করেন। 'আমর' এর অর্থ-নিয়ম বা বিধান প্রণয়ন করাও হয় (কুরআন মজীদ টীকা -৯৮৭)*

*** কার্যকারণের সম্পূর্ণ শৃঙ্খল আল্লাহতে যেয়ে শেষ হয়। তিনিই কারণ পরম্পরার আদি কারণ। কর্ম ও ফল এবং কারণ ও প্রতিফলের ধারাবাহিকতা একটি প্রাকৃতিক বিধান হিসাবে যারা বিশ্ব জগতকে ছেয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি কারণ, যা প্রাথমিক নয়, তা অন্য কারণ হতে উৎপন্ন এবং এই অন্য কারণটিও অপর আর একটি কারণ হতে উদ্ভূত। এরূপভাবে সীমাহীন কারণের এক অসীম শৃঙ্খলে সব কিছুই চলছে (কুরআন মজীদ, টীকা-২৮৮৯)।*

হাদীস

১১। হযরত বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে খন্দকের যুদ্ধে আমাদের সাথে মাটি বহন করতে দেখেছি। এবং তিনি বলেছেন, "আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন না করলে আমরা সুপথ পেতাম না। আমরা রোযা রাখতাম না ও নামাযও আদায় করতাম না"(বুখারী)।

১২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) রাতের বেলা এই বলে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্। সব প্রশংসা তোমারই, তুমি আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক-রব সব প্রশংসা তোমারই, তুমি আসমানসমূহ ও যমীন ও এর মধ্যকার সব কিছুর ব্যবস্থাপক। সব প্রশংসা তোমারই, তুমি আসমানসমূহ ও যমীনের নূর। তোমার বাণী সত্য" (বুখারী)।

মলফুযাত

১১। দ্বিতীয় প্রমাণ, আল্লাহ্তাআলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কুরআন শরীফ আল্লাহ্তাআলাকে সব কারণের আদি কারণ নির্দিষ্ট করেছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'নিমিত্ত ও কারণের সমগ্র শৃঙ্খল তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট পৌছে শেষ হয়।' এ যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানতে হলে গভীর চিন্তার আবশ্যক। যত কিছু আছে সবই নিমিত্ত ও কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ জন্য পৃথিবীতে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। কারণ সৃষ্টির কোন অংশ শৃঙ্খলার বহির্ভূত নয়। কোনটা কোনটার জন্য সূত্র এবং কোনটা শাখা বা প্রশাখা। এটা সুস্পষ্ট যে নিমিত্ত হয় স্বীয় সত্তায় কায়েম হবে অথবা তার অস্তিত্ব অন্য কোন নিমিত্ত হতে উদ্ভূত। তার পর দ্বিতীয় কারণ অন্য কারণের উপর নির্ভরশীল এবং এ প্রকারেই সমগ্র শৃঙ্খল নির্মিত। এটা হতে পারে না যে, এই অসীম জগতে নিমিত্ত ও কারণের শৃঙ্খল কোথাও যেয়ে শেষ হবে না। আর অসীম হলেও প্রয়োজনের খাতিরে মানতে হয় যে, এই শৃঙ্খল নিশ্চয় কোন না কোন শেষ নিমিত্তে পৌছে শেষ হয়েছে।' অতএব এ সকল শৃঙ্খল যাঁর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে তিনিই আল্লাহ্ (ইসলামী নীতি দর্শন)।

সংকলনে- খোন্দকার আজমল হক

আহবান

কে এম মাহমুদুল হাসান

দেখছি কি আজ চারিদিকে ভাই
দাঙ্গা-ফাসাদ খুনখারাবি।
মুসলমানের লেবাস তলে
ইনসানিয়াত খাচ্ছে খাবি।

দাজ্জালিয়াত করছে তাড়া
ইয়াজুজ মাজুজ জগত জোড়া।
ইসলামের এ এতীম দশা
সহ্য কি হয় নেতৃহারা?

কোথায় সে দল খোদার রাহে
করবে যারা জীবন বাজী
কোথায় হাদী সত্য-পথিক
আঁধারে পথ দেখায় সঠিক?

এলেন শেষে খোদার এ বীর
সত্যই যাঁর নিত্য সহায়
মিথ্যে ভেজাল ফাঁকির জগত
দেখে যাকে দৌড়ে পালায়।

আসুন সারা জগদ্বাসী
মুক্তি পাবার যুক্তি দেখে—
সিন্দাবাদের জাহাজ বোঝাই
পাপের পাহাড় যাক না ঢেকে!

সম্পাদকের কাছে লিখিত পত্র

মুলতান (পাকিস্তান) থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "আস সাঈদ" এর সম্পাদকের নামে লাহোর নিবাসী জনৈক ব্যক্তি একটি পত্র লিখেছেন, যা উক্ত পত্রিকার জানুয়ারী '৯৮ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রে লেখক অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত ও অভিমত প্রকাশ করেছেন। সম্পাদক সাহেব লিখেছেন আমরা ইহাকে "পাঠক বৃন্দের জন্যে উপহার" এর কলামে শামিল করার পরিবর্তে পৃথকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সকল পাঠক বা সকল মনের অভিমত চিঠিতে উল্লেখিত মন্তব্যের সাথে একমত হওয়া জরুরী নয়। তথাপি বলতে হয় যে, তার কথার ভিত্তি থাকতে পারে। যদি কোন বন্ধু এই ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করতে চান তা হলে "আস্ সাঈদ" তা ছাপিয়ে প্রকাশ করতে প্রস্তুত রয়েছে।

সম্পাদক মহোদয়!

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্। অনেক দিন থেকে ভাবছি চিঠি লিখবো। কয়েক বারই আমি কলম নিয়ে বসেছি– কাগজে কিছু উল্টা সিধা রেখাও টেনেছি, তারপর অন্য কিছু ভেবে তাকে চিঠির রূপ দিতে পারিনি– এই অবস্থায় অনেক দিন কেটে গেল।

উল্টা সোজা, তেড়াতিরছা কিছু রেখা আমাকে টেনে নিয়ে "পাগলপনা করে তুললো, বন্ধুত্ব ঐ প্রাচীরসমূহের"

কিন্তু এখন আর ধৈর্যের শক্তি রইল না, ধৈর্যের সীমা লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেছে। মোটের উপর এখন আমি আমার ঐ সব বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনাকে একত্রে জড়ো করছি–হয় তো, কোন পরিষ্কার স্বচ্ছ প্রবন্ধের আকার ধারণ করতেও পারে। প্রকৃতপক্ষে আমি আপনার দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাই যে, বর্তমানে আমাদের প্রিয় দেশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতার বন্যার পশ্চাতে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কাজ করছে, যা পূর্ণ শক্তি নিয়ে সম্মুখে এগুচ্ছে। এসব লোক নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পাকিস্তানকে একটি "নজদী স্টেটে" (সউদী রাষ্ট্রে) পরিণত করতে চাচ্ছে এবং তারা এই উদ্দেশ্য লাভের পথে যে কোন মূল্য আদায়ের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রে যোগদানের জন্য কতৃক আরব দেশও নিজেদের ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমি আপনাকে যে চিঠিটি লিখছি এটাকে চিঠির আকারেই রাখতে চাই, কোন প্রবন্ধের আকার দিতে চাই না। তবে আমি আপনার ঐ সকল উদ্ধৃতির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যা আপনি "মুসলিম উম্মত ও পঞ্চদশ শতাব্দী" বিষয়ক প্রবন্ধে উপস্থাপন করেছেন, বিশেষভাবে "ওয়াহাবীদের" (আহলে হাদীসদের) তৎপরতা এবং তাদের দ্বারা মুসলিম উম্মতের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও বিশৃঙ্খলা বিস্তার করার চেষ্টা যা ইংরেজরা করেছিল, আজ পাকিস্তানেও সেইরূপ অবস্থাই সৃষ্টি হতে চলেছে বলে দেখা যাচ্ছে। একদিকে তো "মুসলিম" কার্যকলাপ চলছে আর অপর দিকে পাকিস্তানের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো অপর দিকে পাকিস্তানের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে নজদীদের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করার এবং মূল কাঠামো ও পদসমূহের উপর পাকিস্তান বিরোধী শক্তিগুলির দখল ও কর্তৃত্ব স্থির করার প্রক্রিয়া এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদকে বিস্তারকারীদেরকে মনোনয়ন প্রদান করার প্রক্রিয়াও সমান্তরালভাবে চলছে।

সম্পাদক মহোদয়! আপনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির পদের জন্য তারার সাহেবের মনোনীত হওয়ার বিষয় হতে কী মর্ম গ্রহণ করেছেন? ইতোপূর্বে ধর্মবিষয়ক প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব রাজাজীর মনোনয়নের বিষয়টিকে আপনি হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যাচাই করেননি। তাদের নজদীবাদের বিষয়ে কি কারো কোন সন্দেহ হতে পারে?

পাঞ্জাবে "বায়াতুল মাল" এর মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব কার ঘরে গিয়েছে? আপনি কি এইসব লোকের অতীত সম্পকে অবহিত নন। তারপর ইসলামী তত্ত্ব-বিষয়ক মজলিসের চেয়ারম্যান সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুন, তাদের সকলকে একই সারিতে সত্তায় সমান দেখতে পাবেন। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি এই চিঠিটি কোন প্রবন্ধের আকারে লিখছি না, লিখলে এমন অসংখ্য ঘটনা এবং শত শত মনোনয়ন রয়েছে, সেগুলির দৃষ্টান্ত আমার এই কথাকে দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌছিয়ে দিতে পারতো। আমি এ-ও বিশ্বাস করি যে, যুগদিশারী ইমাম আহলে সুন্নত হযরত গাযযালী সাহেব, আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ সাঈদ কাযেমীর পুত্র সৈয়্যদ হামেদ সাঈদ কাযেমী, প্রধান সম্পাদক "আস-সাঈদ" ও এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে ভালরূপেই ওয়াকেফহাল আছেন; কারণ অনেক বিষয় এমন রয়েছে যেগুলি আমরা দেখতে পারছি না কিন্তু তাঁদের সামনে রয়েছে। আমি মনে করি যে, আপনারা যে নীতির অনুসারী তা হচ্ছে, "নিজের আকীদা ছেড়ে দিও না–, অন্যের আকীদাকে কটাক্ষ করো না।" তৎসঙ্গে আপনারা প্রিয় দেশের অবস্থা সম্মুখে রেখে ইহার প্রতিরক্ষা ও মজবুতি সাধনের চেষ্টায় নম্র কথা বলে থাকেন ঠিক সেই মা'র অনুরূপ –যার "কলিজার টুকরাকে" অপহরণ করে অপর এক স্ত্রীলোক নিজের কবলে নিয়ে নিয়েছিল। যখন দুই দাবীদারের উপস্থিতিতে এই রায় দান করলেন যে, শিশুটিকে দুই টুকরো করে ঐ দুই স্ত্রীলোকের মধ্যে ভাগ করে দাও, তখন – তৎক্ষণাৎ আসল মা তার নিজ দাবী পরিত্যাগ করে দিল, যাতে তার কলিজার টুকরা – সন্তানকে টুকরা টুকরা করা না হয়।

কিন্তু সম্পাদক মহোদয়! এস্থলে তো আমাদের প্রিয় দেশকে অপহরণকারিণী "সৎ মা" পূর্বেই দুই টুকরা করেছে; এই সব লোকদের তখনো কোন কষ্ট হয়নি। আর আজো তারা নিশ্চিত। কারণ তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দলের মধ্যে আমরা শামিল ছিলাম না। তারা এই সব কথা মুক্তকণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছে এতে তারা গর্ব বোধ করে। এই সব লোকই তারা, যারা বলেছিল যে, প্রথমত: পাকিস্তান হতেই পারে না; আর খোদা না করুন যদি হয়েও যায় টিকে থাকবে না। এখন এই চক্রান্তকারী লোকগুলিই নিজেদের এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকেই চিন্তাধারাকেই সঠিক প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে প্রিয় দেশের মূল শিকড় কর্তন করছে এবং "অবশিষ্ট" পাকিস্তানকে করায়ত্ত করার ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।

এখন এই কথা তো কারো কাছে গোপন নেই যে, আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের আন্দোলনের যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, তার সূচনাও "সৈয়্যদ আহমদ" এর কাল্পনিক জেহাদের কাহিনী থেকেই আরম্ভ হয়। সম্ভবত: মাওলানা রুম এর উদ্ধৃতি থেকে বা অন্য কোন এক বুযুর্গের কবিতা থেকে অনেক পূর্বে শুনেছিলাম"

জুঁ কলম দর দস্তেগাদ্দারে রসীদ,
লাজরম মনসূর বরদারে রসীদ।

যখন কলম কোন গদ্দারের হাতে চলে যায়, তখন অবশ্যই মনসূর (নিষ্পাপ লোক)-কে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলতে হয়।

পাকিস্তান আন্দোলনের বিশ্বাস ঘাতকদেরও এই চেষ্টাই চলছে যাতে "পাকিস্তান আন্দোলনের মনসূরকে" ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলানো যেতে পারে। এইরূপ তারা তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। তাই বিশ্বস্ত পাকিস্তানীদের একান্ত কর্তব্য তারা যেন এই বিষয়টির উপর দৃষ্টিপাত করেন, জাগ্রত হন এবং নিজেদের দীন-ধর্ম ও ঈমান-আমলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

সম্পাদক মহোদয়! একটি কথা আমাকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে হয়; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সঠিক বিশ্বাস পোষণকারী এবং সত্যিকার পাকিস্তানী মহল এই বিষয়ে চিন্তা করবে না। বিষয়টি হলো এই যে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর জন্য যেসব খতীব নির্বাচিত হন তাদের মধ্যে নজদীবাদ গ্রহণকারী, ওয়াহাবী বা ওয়াহাবীপসন্দ লোকদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সামান্য চিন্তা করলেও বুঝা যায় যে, জি,এইচ, কিউ,এর ইসলামী তত্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রণে তারাই ব্যবস্থাপক হিসাবে আছেন যারা পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী খতীবদের নির্বাচন করে থাকেন। যে সকল খতীব নিজেদের যোগ্যতার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হন তারা ব্যবস্থাপকদের মাপ কাঠিতে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন; তাদিগকে বিভিন্ন বাহানায় কাটছাঁটের আওতায় এনে বিরক্ত করা হয়। তাছাড়া এটাও একটা দুঃখজনক বিষয় যে, এই উদ্দেশ্য সামরিক বাহিনীতে ধার্যকৃত ও প্রচলিত নিয়ম নীতি ও যথারীতি পালন করা হয় না।

এই কথাও পরিষ্কারভাবে জানা গিয়েছে যে, এইসব লোক বিভিন্ন ইউনিটে তাদের মতাবলম্বী কর্মকর্তাদের দ্বারা মিলাদ শরীফ এবং দরূদ ও সালামের মহফিলসমূহ বন্ধ করে দিচ্ছে। অপর দিকে, সামরিক বাহিনীর ছাউনির আশে পাশে তাদের তবলিগী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার, কিছু দিন পূর্বে সামরিক বাহিনীর ইউনিটগুলিতে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তাঁর পিছনেও আসলে ওয়াহাবী বা নজদী ব্যবস্থাপকদের হাত ছিল। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, 'খানা ফরহঙ্গ ইরান' মুলতানে সাত ব্যক্তি হত্যার যে ঘটনা ঘটেছিল উহার অপরাধীদের মধ্যে একজন সামরিক বাহিনীর লোক বাহাওয়ালপুরে এক খতীবের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এই খতীব ঐ বিশেষ লবীর একজন তৎপর সদস্য যে-লবী (Lobby) এই প্রিয় দেশকে নজদী ষ্টেটে পরিণত করতে চায়।

আর একটি শেষ কথা বলতে চাই, – শেষ কথা চিঠিতে উল্লেখিত সূত্র অনুযায়ী – নচেৎ কথা তো প্রকাশ পেয়েই গেছে–এখন দেখুন কোথায় নিয়ে আসে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি অবশ্যই আমার এই চিঠিটি "আস্ সাঈদ" পত্রিকায় প্রকাশ করবেন। কথা-বার্তার ধারা পরেও অবশ্য প্রবহমান থাকবে, – হাঁ, শেষ কথাটি হলো, যে তিনটি সূত্র চিঠিতে প্রথমে উল্লেখ করেছি অর্থাৎ তারার সাহেবের পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির পদে মনোনয়ন, – পাঞ্জাবের বায়তুল মালের কর্মকর্তার মনোনয়ন, – প্রাদেশিক ধর্মমন্ত্রী হিসাবে জনাব রাজাজীর মনোনয়ন – আমাদের লোকেরা বলে থাকে যে, তারা সবাই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ ও তাঁর পিতা মিঞা মুহাম্মদ শরীফ-এর মঞ্জুরী ও ইচ্ছা মোতাবেক মনোনীত। এরা তো নজদী নন। তাই, তাদের খিদমতে নিবেদন এই যে, মিঞা মুহাম্মদ শরীফ এবং তাঁর শিষ্যমন্ডলীর দীন-ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর দুনিয়া প্রাধান্য লাভ করে ফেলেছেন, তাদের রাজনীতি তাদের ধর্মেও ধর্মাদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার। আমি কোন রকম দোষ আরোপ করতে চাই না, কারণ বন্ধুরা বলে থাকেন যে, এখন মিঞা মুহাম্মদ শরীফ সাহেব অধিকাংশ জুমআর নামায "রায়ভিণ্ড" যেয়ে আদায় করে থাকেন। তিনিও পাক্কা রায়ভিণ্ডী হয়ে গেছেন। ঐ সকল মহলের কি জানা আছে যে, তাঁর এক সুসন্তান মিঞা আব্বাস শরীফ চিল্লাকশির জন্য রায়ভিণ্ড গমন করে থাকেন এবং তিনি তাদের তবলিগী তৎপরতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকেন।

ভাল কথা, – আরও একটি কথা বলা হয় যে, মিঞা সাহেবের পরিবারবর্গকে এক বন্ধু, প্রফেসর ডাক্তার তাহেরুল কাদেরী সাহেব, বিপ্লব সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। বিপ্লবের নেতা মিঞা সাহেবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এখন তিনি নূতন বন্ধু খোঁজ করে নিয়েছেন। হাঁ, ঐ নূতন বন্ধুদের নিকট আবেদন করছি,– ইতিহাসে এক মুগল রাজকুমার নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর নিজের জন্য একটি বাক্য সংরক্ষিত করিয়েছিলেন। সেই বাক্য ঐ সম্রাট তার প্রেমিকা তার মন মানসিকতার উপর নিয়ন্ত্রণকারিণী সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের জন্য ব্যবহার করতেন। নূর জাহান এক খোলা মনের শিয়া ছিলেন এবং নিজের আকীদাসমূহের ছাপ জাহাঙ্গীরের উপরও বিস্তার করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে গোটা ভূখণ্ডের উপর এই সব আকীদা বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে আলাপ করলেন এবং বললেন, তিনি যেন শিয়া আলেমদেরকে শাহী দরবারে সম্মানের স্থান দান করেন। জাহাঙ্গীর উত্তরে বললেন"

(জানে মান্ –জান দাদাহ আম ঈমান নাদাদাহ আম)

"হে আমার জান! আমি তোমার সমীপে প্রাণ উৎসর্গ করেছি, ঈমান তো উৎসর্গ করিনি।"

মোট কথা, জনাব তাহেরুল কাদেরীর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী তাঁরই নিকটতম বন্ধু মুফতী মুহাম্মদ খাঁ কাদেরী তাঁর ঐ সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করেছেন যা তিনি "আহ্‌লে সুন্নত" পত্রিকাকে প্রদান করেছেন। ওতে তিনি মিঞা মুহাম্মদ শরীফের পরিবারের অনুগ্রহ রাজি এবং জনাব তাহেরুল কাদেরীর অকৃতজ্ঞতার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সুন্দর সুন্দর দামী গাড়ী এবং লক্ষ লক্ষ টাকা নযর নযরানার বিশদ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ স্থলে সঠিক ও সত্য পথ এবং বক্ষসমূহেরই হচ্ছে ত্রুটি। হাঁ, ইহার দায়ী যদি কাকেও করা যায় তাহলে মুফতী মুহাম্মদ খাঁ কাদেরী এবং অপরাপর চার সঙ্গী হয়েছেন যারা ল'কলেজের একজন সাধারণ -লেকচারারকে মিঞা সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে এত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করেছেন এখন এর প্রতিকার ও সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়ীও তারাই– আমি সেই সাক্ষাৎকারও পড়েছি, ওতে বন্ধনীর মধ্যে অনুতাপের ঝলকও অনুভব করেছি যা তাঁর অন্তরে জনাব তাহেরুল কাদেরীকে উন্নতি দানের অপরাধের পরিণামস্বরূপ বিরাজ করছে। আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে এই তৌফীক দান করুন যেন তারা এই অন্যায়ের প্রতিকার এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আর বেশী কী লিখবো। চিঠি যথেষ্ট দীর্ঘ হয়ে গেল। শান্তি-সম্মানসহ বিদায়।

আপনার শুভাকাংখী
সোহায়ল শরীফ, লাহোর
অনুবাদ: মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL
Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. N0. 59 • 19th Issue April 15, 1998 Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272

কানাডায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

উত্তর মেরুতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে

আমেরিকায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)